প্রভাবে উত্তমপুরুষের বহুবচনেও হ-কার আসিয়া যায়—'চলসি, চলহি—চলহু' (< প্রাকৃত 'চলসি—চলহ')। অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক্ যে উত্তমপুরুষের এই হ-কারকে আগমাত্মক বলিয়া ধরিয়াছেন, একটু অন্যভাবে আমি তাহার সমর্থন করিতে চাই। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের প্রস্তাবিত '-অম্হ' হইতে '-অহুঁ,' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা তাদৃশ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের '-ম্হ' আধুনিক ভাষার প্রাচীন যুগেও '-ম্হ' রূপেই থাকে, অপভ্রংশের যুগে এই '-ম্হ'-এর 'হুঁ' বা 'হুঁ'তে পরিবর্ত্তন কতকটা আকস্মিক এবং অনপেক্ষিত হইয়া পড়ে। পশ্চিমা অপভ্রংশের এই '-হুঁ' প্রত্যয়ের সহিত মধ্যযুগের বাঙ্গালার '-হুঁ' প্রত্যয় সংযুক্ত বলিয়াই মনে হয়; তবে মূলে পৃথক্‌ও হইতে পারে।

[৫] উড়িয়ার উত্তমপুরুষের রূপগুলির সম্বন্ধে এইবার দুটি কথা বলিয়া আমার মন্তব্য শেষ করিব। বর্ত্তমানে উত্তমপুরুষের একবচনে—'মুঁ করেঁ', বহুবচনে 'আম্ভে বা আম্ভেমানে করুঁ'। 'মুঁ করে'—এইরূপ চন্দ্রবিন্দুহীন রূপও পাওয়া যায়—গঞ্জাম জেলায় উড়িয়ার। 'মুঁ করি'—এইরূপ ই-কারান্ত রূপ কোনও ব্যাকরণে পাই নাই, কেবল স্যর জর্জ গ্রিয়ার্সনের Linguistic Survey of Indiaতে আছে; এক 'মুঁ অছি'—এই 'অছ' ধাতু ভিন্ন অন্যত্র অনুনাসিক ই-কারান্ত রূপ সাধারণ উড়িয়ায় অজ্ঞাত; যদি কোনও প্রাদেশিক রূপভেদে মেলে,তাহা হইলে ইহাকে 'করেঁ' এই রূপের দ্রুত-উচ্চারণ-জাত বিকার বলিয়াই ধরিতে হইবে। সুতরাং, উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের রূপ হইতেছে—'করেঁ > করে > করি'। 'করেঁ, করে, করি'-র উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঠিকই ধরিয়াছেন: 'করোমি' > 'করমি' > 'করবিঁ' > *করই > 'করেঁ'। 'করি' এই রূপটি সন্দেহ-জনক, এবং ইহাকে 'করেঁ > করে'-রই বিকারজাত বলিয়া ধরিবার পক্ষে অন্তরায় কিছুই নাই; ইহাকে বাঙ্গালা 'চলি'র মত কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের 'ক্রিয়তে' > '*কর্‌য্যতি' > 'করীঅদি' > 'করীঅই' হইতে আনিবার প্রয়াসের কোনও আবশ্যকতা নাই। উড়িয়ার বর্ত্তমান উত্তমপুরুষ বহুবচনের ক্রিয়াপদ —যথা 'করু'—পশ্চিমা অপভ্রংশের 'করহুঁ-র সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে,—যেমন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন; কিন্তু আমার মনে হয়, পশ্চিমা অপভ্রংশের দিকে যাইবার প্রয়োজন নাই; মাগধী অপভ্রংশ হইতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে— কুর্মঃ' > 'করোম' > 'করম' > *করব্বঁ' > 'করউঁ' হইতে করুঁ'-কে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিবার পক্ষেও কোনও অন্তরায় নাই।

[৬] এই সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। উড়িয়ায় বাঙ্গালার চল-ধাতু পাই না—পাই 'চাল', আ-কার-যুক্ত রূপ; মধ্যযুগের বাঙ্গালায় 'চলোঁ—চলী', আধুনিক বাঙ্গালায় 'চলি'; বিহারীতে ও হিন্দীতেও এই 'চল্' ধাতু;—কিন্তু উড়িয়ায় 'চালেঁ—চালুঁ'। 'চাল'—এই আকারযুক্ত রূপের কারণ কি? গুজরাটীতেও আকারযুক্ত 'চাল'—অন্য ভাষার মত অ-কার-যুক্ত 'চল' ধাতু নাই: 'হুঁ চালুঁ—অমে চালিয়ে' = 'অহং *চল্যামি'—অস্মাভিঃ চল্যতে'। উড়িয়ার ও গুজরাটীর তৎসম বা সংস্কৃত এবং তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দে মূলস্থানীয় সংস্কৃতের শব্দের মধ্যস্থিত '-ল- -লা- -লি- -লী- -লু- -লূ- -লে- -লো-' মূর্দ্ধণ্য

ল্লতে- পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃতের '-ল্ল -ল্লা' ইত্যাদি দ্বিত্বাবস্থিত 'ল্ল' থাকিলে, তাহার পরিবর্ত্তন হয়—সাধারণ দন্ত্য ল-য়ে। যেমন উড়িয়া 'ভল' (=ভল্ল=*ভদ্‌ল=ভদ্র), 'তেল' (=তেল্ল=* তৈল্য বা তৈল), কিন্তু 'কাল্ল' (=কাল) 'তুল্লা' (=তূলক), ইত্যাদি। সংস্কৃত 'চল্' ধাতুর উড়িয়ার 'চল্ল' রূপ গ্রহণ করা উচিত; 'চাল্ল চল্লণ' 'গোপাল্ল' প্রভৃতি শব্দে এইরূপ মেলে। কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 'চল্' ধাতুর প্রতিরূপ উড়িয়াতে 'চাল'—'চাল্ল' নহে: উড়িয়া 'চাল্'-এর প্রাকৃত মূল হইবে 'চল্ল', এবং ইহার সংস্কৃত আধারস্থল হইতেছে '*চল্য',—'চল্' নহে। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে কর্ম্মবাচ্যের '*চল্যতে', কর্ত্তৃবাচ্যের 'চলতি'-র পার্শ্বে স্থান পায়—'অহং চলামি—অস্মাভিঃ *চল্যতে' > প্রাকৃতে 'চল্লমি—চল্লই'; পরে 'চল্লই' হইতে 'চল্ল' > 'চাল' আসিয়া ধাতুর মৌলিক রূপটিকে গ্রাস করিয়া বসে। তাই উড়িয়ায় (এবং গুজরাটীতে) 'চাল্' ধাতু,—'চল্' নহে। এ বিষয়ে মৎপ্রণীত পুস্তকের ৯৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৭] মধ্যযুগের বাঙ্গালায় '-ইউ' প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি কর্ম্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের বলিয়াই মনে হয়; চর্য্যাপদের দুই একটি প্রয়োগ '-ইউ' প্রত্যয়ের সঙ্গে যে কেবলমাত্র উত্তমপুরুষের কর্ত্তার যোগ নাই, প্রথম বা মধ্যমপুরুষেরও আছে, তাহা বুঝা যায়; এবং ইহা হইতে এই প্রত্যয়ের মূল যে অনুজ্ঞা উত্তমপুরুষ বহুবচনের রূপ নহে, বরঞ্চ কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের প্রথমপুরুষেরই রূপ (একবচনের), তাহা সুস্পষ্ট।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

———

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী

গ্রন্থ-পরিচয়

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়॥ প্রণমহো গুরুদেব করিয়া ভকতি। চরণযুগলে তার দণ্ডবৎ নতি॥" এইরূপে গুরুবন্দনায় গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। যে পুঁথিখানি লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সেখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে, সং ৪০৫১। ৪৮ পাতা, দুই পৃষ্ঠায় লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ৮ সারি বা ৯ সারি লেখা। রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গের উদাহরণে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, প্রকারভেদ ও অবস্থা, দূতী সখী আদির পরিচয়, ভাববিচার, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের বিচার ইত্যাদি অতি সংক্ষেপে এই পুথির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি ও অলঙ্কার-কৌস্তুভের পর বৈষ্ণব রসগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক এই ধরণের পুথির মধ্যে এত পুরাতন পুথি বোধ হয়, আর পাওয়া যায় না। পুথিখানি প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"রাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লি গ্রন্থের করি নামে। প্রতি দলে রসের কোরক অনুপামে॥" গ্রন্থশেষে একটি অনুক্রমণিকা আছে,—"প্রথম কোরকে কহিলাম মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় কোরকে কহিলাঙ নায়ক বর্ণন॥ তৃতীয় কোরকে কহিল নায়িকা পরিবার। চতুর্থ কোরকে কহিলাঙ ভাবের বিচার॥ পঞ্চম কোরকে কহিলাম নায়িকা বর্ণন। ষষ্ঠমে বিপ্রলম্ভের দিগদর্শন॥ সপ্তমে কহিলাঙ ভক্তি অনুরাগ। অষ্টমে কহিল নায়িকা বিভাগ॥ নবমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ। দশমে কহিল তাহার বিশেষ বচন॥ একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল। দ্বাদশে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল॥ নিজাভীষ্টরূপ করিল নিবেদন। কৃষ্ণের লীলা কিছু না হয় বর্ণন॥ ভাষা করি ক্রমে অন্তরে হয়ে ক্ষোভে। প্রবন্ধ করিয়া কহি এই সব লোভে"॥ এক একটি কোরকের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে। (১) প্রথম দলে 'সুমঙ্গল' কোরক, (২) × × × × ×, (৩) 'সখিকদম্ব নাম' তৃতীয় কোরক, (৪) 'ভাবকদম্ব' নাম চতুর্থ কোরক, (৫) 'সখিকদম্ব' নাম পঞ্চম কোরক, (৬) 'দূতিকদম্ব' নাম ষষ্ঠ কোরক, (৭) 'সঘনা' নাম সপ্তম কোরক, (৮) 'নাইকা বর্ণনা', (৯) 'মধুমাধবি' নাম নবম কোরক, (১০) 'বিলাসকদম্ব' নাম দশম কোরক, (১১) 'প্রকাশ-কমল' নাম একাদশ কোরক, (১২) 'সরস কমল' নাম দ্বাদশ কোরক।

পুথি রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখও পুথিতে আছে,—"আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে। বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শকে॥ সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ। বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি। পুস্তক হইলে কল্যাণ দণ্ডবৎ নতি। কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে। বৈষ্ণব গোসাঞি দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥"

কি উপলক্ষে পুথি রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, পুথির মধ্যে সে কথারও উল্লেখ

পাই,—"উপরোধে বন্ধি ভাই উপাধি না দেখিবে। জে কহি নিবেদন নিশ্চয় জানিবে॥ জাজিগ্রামে মহাশয় শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণ উজ্জলরসলীলা পরিপুর॥ তাঁহার প্রিয় শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নাম। বসতি গঙ্গার পার ফ'রদপুর গ্রাম॥ এক সেবকে তিহোঁ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দিলা। আমাকে তাঁহাকে তিঁহো সমর্পণ করিলা॥ ইহাকে পঞ্চ তত্ত্ব জত আদি লীলা। আপনে কহিয় আমাকে কহিলা॥ সেই উপরোধে ভাষা করি দুই চারি। কৃষ্ণকথা গাঁথিলে হয় অবশ্য মাধুরি॥ অতএব সভার চরণে করি নিবেদন।"

পুস্তকের রচনা-কাল লইয়া মতভেদ হইবে। কারণ, অঙ্ক বলিতে বেদের ষড়ঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ এবং ভক্তিশাস্ত্রের নবাঙ্গ—তিনই বুঝাইতে পারে। এই হিসাবে ১৫৮৫, ১৫০৫ ও ১৫৯৫ শকাব্দ হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মত কোনও অভিজ্ঞ পণ্ডিত যদি হিসাব করিয়া বলিয়া দেন—উক্ত তিন সালের মধ্যে কোন্ সালে কার্ত্তিক মাসের বুধবারে অমাবস্যা হইয়াছিল, তাহা হইলেই এ সমস্যার মীমাংসা হইবে। পুথি নকলের কোন তারিখ নাই, নকল-কারকেরও নাম নাই। লেখা আছে,—"কৃষ্ণা কার্ত্তিকস্য সপ্তত্তরদিবসে বৃহস্পতি বারে দশমিতে গ্রন্থ সমাপ্ত করিল।" ইহারও মীমাংসা উক্তরূপে হইতে পারে। সাতই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দশমী।

পুঁথিখানি নানারূপ ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ, অবশ্য ইহা লিপিকর প্রমাদের ফল। বানানের ভুল আছে, অনেক কথা ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। সংশোধন আছে বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সংশোধক কোন কোন স্থান কাটিয়াছেন, অথচ সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। পুথিখানিতে রচয়িতা উদাহরণ স্থলে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে পদকর্ত্তাগণের পদও ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলিও যেমন, অনেক স্থলে বাঙ্গালা পদও তেমনি—প্রায় সমান অপাঠ্য! পণ্ডিতের হয় ত কাজে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া বানানের বিশেষ বিশেষ স্থল অবিকল রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছি।

পরিষৎ-প্রকাশিত রসমঞ্জরীর মধ্যে যে পয়ার রসকল্পবল্লী হইতে উদ্ধৃত বলিয়া ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মারাত্মক রকমের ভুল আছে। এ পুথিতে আছে—"চক্র-পাণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভব।" আর রসমঞ্জরীর পয়ারে আছে,—'চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব। পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥" যেন সেই সময়েই তাহার ছেলেপুলে নাতিপুতি অনেক হইয়াছিল! আমাদের ত মনে হয়, আলোচ্য পুথির পাঠই ঠিক। আলোচ্য পুথির পদের পাঠভুল আমরা সংশোধন না করিয়া যেমন আছে, তেমনি তুলিয়া দিয়াছি।

গ্রন্থকার-পরিচয়

'রসকল্পবল্লী'র রচয়িতার নাম শ্রীরামগোপাল দাস, সংক্ষেপে গোপাল দাস। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে কবির বাস ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস কোথায় ছিল, জানা যায় না; কবির পূর্ব্বপুরুষ শ্রীখণ্ডে আসিয়া গুরুর আশ্রমে বাস করেন। গ্রন্থে কবির গুরুপরিবারের পরিচয় এইরূপ:—"জয় জয় শ্রীমুকুন্দদাস নরহরি। জয় রঘুনন্দন কন্দর্প

মাধুরি ॥ জয় পূর্ণানন্দ কৃপাময় ঠাকুর কাহ্নাই। ত্রিভুবনে জাহার বংশীর তুলনা দিতে নাই ॥ জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ গুণ সর্ব্বধাম ॥ তাহার বংসে মোর ইষ্ট ঠাকুর শ্রীরতিকান্ত ॥ রাধাকৃষ্ণপ্রেম দাতা পরম নিতান্ত ॥"

* * * *

"জয় জয় গুরুদেব শ্রীরতিপতি। তাহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি ॥ জয় জয় ঠাকুরপুত্র শ্রীসচিনন্দন। জয় প্রাণবল্লভ ঠাকুরের চরণ ॥ জয় কনিষ্ঠ ঠাকুরপুত্র যাদবেন্দ্র নাম। এই তিন ঠাকুরপুত্র সর্ব্বগুণে অনুপাম ॥ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ঠাকুর ঘনস্যাম। তাঁহার তনয় ঠাকুর পুরুসোত্তম নাম ॥ শ্রীরঘুনন্দনের বংসাবলী অনেক বিস্তার। অখিল ভুবনে কৈলে ভক্তি প্রচার।"

* * * *

"পরম দয়াল প্রভু করুনা প্রচুর। অদোসদর্শী প্রভু আমার ঠাকুর ॥ সেষ কালে ঠাকুর মোরে করুনা করিয়া। পঞ্চ দিবস কহিল বিবরিঞা ॥ রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বললীলা মাধুর্য্য অতিশয়ে। রাগনিষ্ঠা প্রেমসেবা মাধুর্য্য অতিশয়ে ॥ এই সকল কথা প্রভু কহিল অল্পাক্ষরে। অল্প মেধা মোর নহিল অন্তরে ॥ সঙ্কির্ত্তন করিয়া প্রভু গেলা আতোহাটে। মহাপ্রভু সান্নিধি গঙ্গাব নিকটে ॥ বৃন্দাবন নীলাচল করেন স্মরণ। রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য কহেন গদগদ বচন ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা পঞ্চমী দিবসে। অপ্রকট প্রভু লোকে এই কথা ঘোষে ॥ আমি যে প্রকট রূপ দেখি নিরন্তর। জন্মে জন্মে দুই ভাইয়ের কিঙ্করের কিঙ্কর ॥"

অতঃপর কবি আত্ম-পরিচয় দিতেছেন,—"একমাত্র জন্ম খণ্ডে বৈদ্যবংশে। দুই চারি উপর পুরুষ বৈষ্ণব প্রশংসে ॥ বৈষ্ণবের নাম কহিতে অন্তের নাম হয়। উপাধি করিয়ে নাহি কেবল পরিচয় ॥ ধনন্তরি-কুলে বীজ রাঘব সেন নাম। নানা সমাজ হইতে বৈদ্য আনিল অনুপাম ॥ তাহার বংসাবলি অনেক বিস্তার। কবি পণ্ডিত খ্যাত বৈষ্ণব আপার ॥ দামোদর কবিবর চিরঞ্জীব সুলোচন। জস রাখা (?) আর **শ্রীকবিরঞ্জন** ॥ চিরঞ্জীব সুলোচনের কথা আছয়ে বর্ণ্নন। চক্রপাণি মহানন্দ আর তঁহি দুইজন ॥ নীলাচল গেলা দোঁহে মহাপ্রভুর গোচর। রঘুনন্দনের সেবক কৃপা করিল বিস্তর ॥ দুই ভাইয়ের শিরে চরণ ঠেকাইল। কৃষ্ণসেবা করিতে দুই জনে আজ্ঞা দিল ॥ মহানন্দে কহিল ইহো অকিঞ্চন বৈষ্ণব। চক্রপাণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভোব ॥ সেই আজ্ঞাতে দুই ভ্রাতা খণ্ডকে আইলা। সরকার ঠাকুর কৃপা অনেক করিলা ॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর দিল সেবা করিতে। দুই ভ্রাতার সেবাধর্ম্ম ঘোষে জগতে ॥ চক্রপাণির পুত্র চতুর্ধুরী নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনচন্দ্র সেবা পরম আনন্দ ॥ তাহার তনয় এক চতুর্ধুরি গঙ্গারাম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামরায় নাম ॥ তাহার তনয় শ্রেষ্ঠ মদনরায় নাম। বৈষ্ণবসেবাতে হয়ে অতি অনুপাম ॥ গোবিন্দ-লীলামৃতভাষা কৈল পদাবলি। সদা বাঞ্ছেন তিঁহো বৈষ্ণবপদধূলি ॥ তাহার অনুজ গোপাল মোর নাম। দুষ্টশীল কুলাঙ্গার বিষয়তৃষ্ণকাম ॥ এই সব গোষ্ঠি যদি মহা অনুভব হয়ে কুবুদ্ধি আমাকে জেন ধুস্তর উপজয় ॥ উপরোধে ভাষা করি নহে বর্ণজ্ঞান।

কাক জেন চলিতে চাহে হংস সমান॥ উপাধি নাহি করি দৈন্য না জানিবে। আপন গুণে বৈষ্ণব ঠাকুর করুণা করিবে॥"

* * * *

"অল্পকালে পিত্রি বিয়োগ না হইল অধ্যয়ন। মাতা চন্দ্রাবলি নাম করিল পালন॥ মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংস হয়। প্রমাতামহ মধুসূদন বআসয় (?)॥ কৃষ্ণ সংকির্ত্তনে করেন বায়ন। নৃত্য করেন তাহে শ্রীরঘুনন্দন॥ খণ্ডের সম্প্রদা বলি নিলাচলে কহেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে হয়ে বিবরন॥"

কবির শিক্ষাগুরুগণের পরিচয় এইরূপ—"জয় জয় দিক্ষাগুরুর চরণ। সিক্ষাগুরু মোর হয়ে বহুজন॥ শ্রীব্রজ দেবীদাস ঠাকুর অনেক কহিল মহিমা। খণ্ডের ঠাকুর বাড়ির কথোক সিমা॥ শ্রীরূপ ঘটক ঠাকুর কহিল গ্রন্থ সন্ধান। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য করাল্য অধ্যয়ন॥ শ্রীগিরিধর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অনেক কথা জানি। জয়রাম দাস ঠাকুর স্থানে স্তব কথোক স্থনি॥ গৌরগতি দাস জানাইল বৈষ্ণববন্দনা। পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণ দাস কৈল প্রভুকে সমর্পণা॥ খণ্ড জাজিগ্রাম আর শুদপুর। সভা সঙ্গে ওলা মেলা হইল প্রচুর॥ * * * শ্রীমুকুন্দদাস গোস্যামী আর অধিকারী। সভার স্থানে কথা শুনি দুই চারি॥ তাঁহা সভার চরণ ধ্যান দৃষ্টিমাত্র দেখি। গ্রন্থক্রমে নাহি পড়ি শ্রবণমাত্র লেখি॥ জত জত বৈষ্ণব আছেন ক্ষিতি ভরি। সভার চরণে কোটি কোটি নমস্করি॥"

উদ্ধৃত পদ ও পদকর্ত্তৃগণ

[১] কবিরাজ ঠাকুর (রসকল্পবল্লী গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস 'কবিরাজ ঠাকুর' বা 'কবিরাজ মহাশয়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন)।

(ক) ধরি সখি আঁচরে ভরু উপচঙ্ক।
* * * *
* * * *
ও অতি বিদগদ এ অতি গোঙারি॥

(খ) সঙ্করবরতে আজু পরবেসলো দারুন গুরুজন বোলে।
অতয়ে সে সরস পরশ বিধি বাধল কি তুয়া নয়নহিলোলে।
মাধব তোহারি চরণে পরণাম।
* * * মৌন মোহে লাগল কহইতে বিধি ভেল বাম॥
দুরে কর হার তোহার কবরি রচিত অব নাহি বেসক সাধ।
শ্রবণই একু কুসুম যব হেরব নোনদিনি করত পরমাদ॥
এ মধুমাধ আশ ভেল বঞ্চিত জদি কহ কপট বিলাষ।
করসঙ্কেতে কত সমুঝাওব কহতহি গোবিন্দদাস॥

(গ) হাম বনচারি রহব একসরিয়া।
চাতুরি না কর তুঁহু সতঘরিয়া॥
চল চল মাধব তোঁহে পরনাম।
জাগিয়া সকল নিসি আইল বিহান॥
চল চল মাধব না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাস দগধ কত আর॥

(ঘ) নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে চান্দ বয়ান অবলম্ব॥
এ সখি মোহে না করিবি আন ছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামরচন্দ॥

(ঙ) রূপ চাহি গুণে নাহি উন। সো তনু তেজিবি কাহে মুঞি কহি সুন॥
হাম পেঠব কালিন্দাবারি। তবহি করব পিরিতি তোহারি॥
তবহুঁ সফল তনু মোর। তুঅ জব সুতবি কানুক কোর॥

(চ) সুনইতে চমকই গৃহপতি বাব। * *
* * জলদ নেহারি নয়নে ঝর লোর॥

কবিরাজ মহাশয়—

(ছ) বিতুপতি বাতি বিরহে জরে জাগরি দুতি উপেখলু বামা।
* * * *
* * * *
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে তুহে না হেরব লোষ॥

শ্রীকবিরাজ ঠাকুর—

(জ) না জানিয়ে কেমন মনোরথে আকুল কিসলয়ে দলে করু দংশ॥

(ঝ) মনমথ মকর ডরহিঁ ডর কাঁপী।
তুয়া হিয়ে হার তটিনি তটে কুচঘট উছলি পড়ল তঁহি ঝাঁপি॥
সুন্দরি সম্বরু কটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়সি অব ডারসি ইহ অতি কঠিন বিপাক॥

(ঞ) ডুবে রহু স্যামর বররাগ। স্বামিক সেবন অন্তরাগ॥

(ট) পতি অতি ডুবমতি কুলবতি নারি। *
* * *

(ঠ) মধর মুরলি সবদ করসি নয়ানে বরসি প্রেম।
ইসত হাসিতে অমিয়া পরসি বচনে বরষি হেম॥
কাহ্ন হে বুঝিযে চাতুরি তোর।
সুখ লব লোভে কো পুন বুরব এ দুখসায়রে ভোর॥

শ্রীকবিরাজ—

(ড) তেজহ দারুণ মান মানিনি নাহ গাহক তোরি রে।
তুহুঁ সে ম(র)কত মুরতি মানই কাঁচ কাঞ্চন গোরি রে॥

কবিরাজ—

(ঢ) দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠি।
দুহুঁ চলিলা জমুনাজলে পৈঠি॥
দুহুঁ পন্থ পুছইতে দুতি মতি বাম।
দুহুঁক লহু সহচরি নিজ নাম॥
সহচরি ভরমে দুহুঁ আলিঙ্গনকেলি।
গোবিন্দ দাস কহত তব কিয়ে ভেলি॥

(ণ) রাইবিপতি ধুনি বিদগধশিরোমণি পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির তেজি চলু বর নাগর শুন শুন [পুন পুন ?] পরশই নাসা॥

(ত) চলইতে সংকলি পঙ্কিল বাট।

(থ) চলু গজগামিনি হরি অভিসার।

* * *

মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

(দ) আজু ভেল প্রভাতে কুজঝটি আন্ধিয়ার।
অযতনে ধনিক ভেল অভিসার॥

(ধ) কৈছে ধনি তেজিলি গেহ। * *

* * * আগে হিয়া গমন [মন]মথ সুর॥

(ন) মাধব তোহেঁ সোঁপিল ব্রজবালা।
মরকত মদন মোই জনু পূজই দেই নব কাঞ্চন মালা॥

(প) আকুল চিকুর অলকাকুল সমরি।
সিথি বনাহ পুন বান্ধহ কবরি॥

(ফ) অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিষম শর কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নিঝরু কুচতটে কালিমহারা॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দূর দেশ।
সো অবলা চিরবিরহবেয়াধিনি দশমি দসা পরবেশ॥

(ব) তরুণ অরুণ সিন্দুর কিরণ নীল গগনে হেরি।

* * *

(ভ) রতি বনরঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন রণবাজন পিকুরাব।
দুঁহুক মনোরথ চঢ়ল মদকুঞ্জরে পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ সখি রাধামাধবমেলি।
দুঁহুক চপল চরিত্র নাহি সমুঝিয়ে কিএ কলহ কিএ কেলি॥

(ম) হোর দেখ অপরূপ ছান্দ।
রতির আলসে রাই সুতিয়া রহল গো কানু হেরত মুখচান্দ॥

(য) মদনমদালসে শ্যাম বিভোর। শশিমুখি হসি হসি করু কোর॥

[২] বিদ্যাপতি—

(ক) শশিমুখি তেজল সেশব (শৈশব ?; দেহ।
খত দেই ছোড়ল ত্রিবলিত রে(হ)॥
ইবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ।
উপজল হাস বচন ভেল মিঠ॥
দিনে দিনে বাঢ়ল পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খিন॥

(খ) কুসুমিত কাননে কুঞ্জে বসি। নয়নক কাজর ঘোর মাস॥
নখলিখন নলিনদলখাত। লেখি পাঠাওল আখর সাত॥

(গ)　এত দুখ দেওসি মদন।　হরি লৈয়া বধিলি যুবতিজন॥
নহে মোর জটাজুট কবরিক ভার।　মালতিমালা নহে সুরেশ্বরীধার॥ (অ-প-র)

(ঘ)　দুতি তুহুঁ দারুণ সাধিলে বাদ।
আজি হাম তেজিলুঁ রতিসুখসাধ॥

(ঙ)　সন্ধানি কৈছে জিঅব কাহ্নু।
রাই রহল দুরে হাম মথুরাপুরে এতোয়ে সহএ পরাণে॥ (অ-প-র)

(চ)　রস নাগর রমনি।　কত কত জুগতি মনহি অনুমানি॥
আগিনা আওব জব রসিয়া।　পালটি চলব হাম ইসত হাসিয়া॥
সো হাম আচরে ধরব।　হাম জাওব কত জতন করব॥
কাচুয়া ধরব হরি হটিয়া।　কবে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো অতি সুপুরুখ ভ্রমরা।　চিবুক ধরি অধররস পীব হামরা॥
তৈখনে হরব চেতনে।　বিদ্যাপতি কহে এ তুয়া সফল জিবনে॥

(ছ)　চিরদিনে মো বিধি ভেল অনুকুল।　দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ আকুল॥

(জ)　আজু হরি আওব গোকুলপুর।　ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥

(ঝ)　বিদগধ নাগরি সুনাগর কাহ্নু।　দুরেহি রভস পুরল পাঁচবান॥
কানু রহল মুখে কমল লাগাই।　লাজে কমলমুখি মুখ পালটাই॥
নখ দেই কানু গেড়ুয়া বিদারি।　ধনি কুচে চাপি কহলি সিতকারি। (অ-প-র)

[৩]　অজ্ঞাত পদকর্ত্তা—

(ক)　সুন শুন সুন্দরি মঝু উপদেশ।
জৈছন কুঞ্জে করবি পরবেশ॥
পহিলহি না করবি অভিলাষ।
করে কর ঠেলি উলটবি পাষ॥

(খ)　কাহ্নাই হেন গুণনিধি যদি মিলে কোরে।
অনুক্ষণ লইঞা রাখি হিআর উপরে॥

(গ)　এ খাট পালঙ্কে জদি কানু স্বামি হয়।
তবে সে সিতল নিশি মোর প্রাণে সয়॥

(ঘ)　কালিয় ভুজঙ্গ সঙ্গে নাহি শঙ্কই ভাঁড ভুজগ তুয়া কাঁপে।
দাবানল আনল আতি নাহি পরশই সিন্দুর দহনে তুয়া তাপে॥
সুন্দরি ধনি ধনি তুয়া গুণ জাগি।
সুরাসুর সমরে বিমুখ না হোঅই　সে তুয়া নয়নে শর ভাগি॥

(ঙ)　সায়র হংস কানন মাহা পেখলু নিপতরু হেলন অঙ্গ।
কোঁহি লোভে যতনে ধরি গরাসই ভুজযুগ কালভুজঙ্গ॥

(চ) মাধব মাধবি জব পরকাস।
নিরজন কানন ভরু করু আষ॥
নিভৃতে মধুকর করু মধু পান।
মাতই মনোরথ রভসে করু গান॥

(ছ) মঝু মনহরিন ব্যাধ ভয় কারণ বন বন ফিরই তরাসে।
মরুভূমি তেজি সরোবর আওলুঁ কাতর মদনপিয়াসে॥
সুন্দরি ইথে জদি রোখসি মোয়।
তব হাম তোহারি যৌবনজলে পৈঠব স্বরূপ কহলম তোয়॥

(জ) নবরিতুরাজ বনহিঁ পরবেসল কুঞ্জকুটির পরকাস।
ক্ষুবধ মধুপ লুবধ হই আওল মিলল মাধব (মাধবি) পাষ।
মাধবি মধুযূদন করু কোর।
* * * * অহনিশি রহব অগোর॥

(ঝ) মুরলিমিলিত অধর নবপল্লব গায়ই কত কত রাগ।
কুলবতি হোই বিন্দব ছোড়ি আঅলুঁ সহয়ি না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি সিখাওব গান।
গৌরি আলাপে শ্যাম নট সঞ্চরু তব তোহে বিদগধ জান॥
(প-ক-ত,)

(ঞ) প্রতিপদ নবমি পুজবে নাহিঁ জাওব তোহারি বচন পরমানি।
দ্বিতিয়া দসমি উত্তর না জাওব কহিও সখি কানু রসিক সুজান॥

(ট) নিরমল কুল সিল ভূষিত ভেল রে জব ভেল কানু পরিবাদ।

(ঠ) কে বলে কালিয়া ভাল।
এত দিনে কালার মরম জানিল ভিতরে বাহিরে কাল॥

(ড) তরল বাঁশের বাঁসি নামে বেড়াজাল।
সভারে দুর্ল্লভ বাঁশি রাধারে হইল কাল॥
জেনা বাঁশের বাঁশি সেনা ঝাড়ের লাগি পাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥

(ঢ) রোদতি রাধা কাহ্ন করি কোর।
হরি হরি প্রাণনাথ কাহা গেল মোর॥

(ণ) মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগী।
তুয়া অভিসারে অবশ বররঙ্গিনি জিবই বহুঁ পুন ভাগি॥

(ত) পহিলে কহিলুঁ হাম তোয়। হিত করি না মানিলি মোয়॥
সেহ জানি সহজই খল। তুহুঁ অতি ভৈ গেল সেবল (ভৈ গেলি সরল)॥

(থ) রাতি ছোড়ি ভিন্ন রমনি।
কতক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী॥

(দ) ধানসী॥ কি কহব রে সখি কহনা উপায়।
বিরহে আকুল তনু বিদরিয়া জায়॥
অনুক্ষণ উচাটন করে মোর হিয়া।
কত না রাখিব কুল নিবারণ দিয়া॥ (মাথুর বিরহ নিজ উক্তি)

(ধ) ধৈরজ করহ সখি না ভাবিহ দুখ।
নিকটে মিলব তোহে সে চান্দমুখ॥ (সখি উক্তি)

(ন) বসন্ত॥ মধুকর মাধো সে কহিয়ো জায়।
প্রাণ গেয়ো কা করিয়ে আয়॥
উড়ি উড়ি ভ্রমরা চলহ বিদেশ॥
আমার প্রাণনাথে কহিয় সন্দেষ॥

(প) মধুপুর পন্থি না করু তোয়। মাধবে মিনতি জানবি মোয়॥
কালি দমন করি ঘুচাওল তাপ। রূপরপি কালিন্দি কালিময় সাপ॥
(অ-প-র)

(ফ) দেখিলুঁ স্বপন চারু চন্দন গিরির উপরে বসি।
মালতির মালা দধির ডালা মাধব মিলল আসি॥ (অ-প-র)

(ব) দেখ সখি বৃন্দাবিপিন বিনোদ।
রাইক সঙ্গে রঙ্গে কত নাচত মলয়া সমিরে আমোদ॥

(ভ) গোপালবিজয়ে—
হোর দেখ রাধা পরু দাড়িম্ব রহয়। মিলিতে চাহে তোমার পয়োধর॥
ফুলে জিনিতে চাহে তোমার অধর। বিজে দশনপাঁতি জিনিবে সকল॥

[৪] মহাজনস্য—

(ক) (মানে ধীরা নায়িকার উক্তি) কে তোমারে চিআইলে কাঁচাঘুমে।
আমার হিয়ার মাঝে রসের বালিষ আছে তাহে তুমি ঘুমাহ নিঝুমে॥

(খ) বংসি লাগিল মোর বাদে। সময় না জানে বংশি ডাকে রাধে রাধে॥

(গ) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি ঝুরে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরস লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥—(প-ক-ত,৭৪৮)

(ঘ) গুরুজন পরিজন জতেক গঞ্জে। রতন জলে জৈছে তিমির পুঞ্জে ॥
(অ-প-র, ২৮)

(ঙ) অব মুঞি কেয়া কেরোঁ মুরুলি বাজে বনে।
সুনি তনু পুলকিত প্রাণের সনে ॥

(চ) [প্রহেলিকা] তিন চরণ পর চরণে সিজায়। জিব জন্তু নহে আহার জল খায়।
হে কৃষ্ণ ইহ বড় ধন্ধ। মুণ্ড কাটিলে আহার করে বন্ধ ॥

(ছ) [প্রহেলিকা] লোহার মুদ সুতার কায়। পর মারিতে পরের কান্ধে জায় ॥
হে রাধে ইহ বড় ধন্ধ। ঘর দিঞা চোর পলায় গৃহস্থ পথে বন্ধ ॥
(অর্থ—মাছধরিবার জাল)

(জ) একটি মুরলিরন্ধ্রে দুই জনে বাজায়। কানু শ্রুতি ধরে রাই পহুঁ গুণ গায় ॥

(ঝ) বিজন বনে বনে ভ্রময়ে দুহুঁ। দোঁহার কান্ধে শোভে দোঁহার বাহু ॥
ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে। কনকলতিকা রাই তমালকোলে ॥
—(প-ক-ত, ৩৪৯)

(ঞ) ভাল হৈল্য বাঁসিআর বাঁসি গেল চুরি। আনন্দমগন ভেল গোকুলরমনি ॥

(ট) আইসহ জদি জয় দিয় বৃন্দাবনপুরে।
আমার ঘরের চান্দমুখির বিবাহ কালিয়া শোনা বরে ॥

[৫] শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর—

অনুক্ষণ কোণে থাকী বসনে আপনা ঢাকী দুয়ার বাহিরে পরবাস।
আপন বলিঞা বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে হেন ছারের হেন অভিলাস ॥
সজনি তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
এহেন দুলহ জনে অনুরকত জাহার মনে নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥
(পদকল্পতরু, ৮৩৯)

[৬] গোপাল দাস (গ্রন্থকার)—

(ক) অপরূপ পেখলুঁ কানন ওর। কনকলতায় ধয়ল কিয়ে জোর ॥
চল চল মাধব করহ পয়ান ॥ দেওল ফল বিহি তোহারি মনমান ॥
অজামুক রুক (রুখ) ফলদ্বয় ভেল। কেহো কহে দাড়িম কেহো কহে বেল ॥
কেহো কহে মাকন্দ* ফলল অকাল। কেহো কহে পাকল মনমথ তাল ॥
গোপালদাস কহে উঁহু রসে ভোর। জানলুঁ ফল নহে কনক কটোর ॥

(খ) থিরবিজুরিবরণ গোরি দেখিলুঁ ঘাটের কুল।
কানড় ছান্দে কবরি বান্ধে নব মল্লিকার ফুল ॥

* মাকন্দ-আম্র

সখি স্বরূপ কহিলুঁ তোয়।
আড় নয়নে ইষত চাহিঞা বিকল করল মোয়॥
ফুলের গাঁড়ুয়া লোফিঞা ধরে সঘনে দেখায় বুক পাস;
উচ কুচে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ যুগল মল্ল তোড়ল সুরঙ্গ জাবক রেখা।
গোপালদাসে কয় পাবে পরিচয় পালটি হইলে দেখা॥

(গ) নবঘন বরণ উজোর। হেরি লুবধ মন মোর।
তুয়া রস পাওব আসে। মাধবিলতা পরকাসে॥
তোহারি পাণি জব পাব। গিরি জুগ আনন নিভাব॥
নিতম্বে মিলব জব পানি। তব পরকাসই অম্বর জানি॥
গোপালদাসের চিতে ধন্দ। ভাবই স্যামরূচন্দ॥

(ঘ) গুরুজন মন্দিরে সবহিঁ তেজি চললহিঁ চান্দ গহন দিন লাগি।
একল নারী কৈছে হাম বঞ্চব এ ঘোর জামিনি জাগি॥
মাধব তুঁহু জানি করসি অকাজ।
চঞ্চলচরিত তোহাঁরি হাম জানিয়ে পৈঠই জানি পুরমাঝ॥
পহলি যৌবনকাল মুঝে লাগল নাহ রহত দূরদেশ।
হেরইতে রূপ মদন মুরছায়ই কো বুঝে বচন বিশেষ॥
ইথে লাগি তোহে নিসেধ হাম পুনপুন অন্যত্র করহ পয়ান।
শুনইতে কান বচন অনুমানই গোপালদাস ইহ গান॥

(ঙ) কালিয়দমন জগই তুয়া ঘোষই সহচরি সুনই কানে।
উহাসঞে বাধ সাধ সব ধাওল মনোরথ চঢ়ল ঝাঁপানে॥
মাধব তোহে কহি ইথে লাগি
ত্রিবলিক মাঝ রোম ভুজঙ্গিনী হেরইতে তুহুঁ জানি ভাগি॥
নয়ান কমলপর ভাহুঁ ফনিবর কাজর গরল উগারি।
মদন ধনন্তরি আপ জব আওব সো বিখ তবহিঁ নাহি সারি॥
বেনীভুজগবর পীঠপর চুলত চিরদিন ভুখিল পিআসে॥
শুনইতে নাগ নাম তনু কাঁপই কহতহিঁ গোপালদাসে॥ (প-ক-ত, ১০৫২)

(চ) মঝু মনে দংশল মদন ভুজঙ্গ। গরল ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
অব জদি সুন্দরি করসি উপায়। দগধল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি হেরি ঝাড়িবি দিঠিসার। করে কর পঙ্কনে ভাব সংভার॥
বদনহি দংশনে বদন বিখ সেবি। যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি॥
শ্রমজল অঙ্গহি জবহিঁ বিথার। কুচযুগে কলসে করিবি পানিসার॥

খরনখ রঞ্জন তুয়া নখ মানি। সমুঝবি নিরবিখ উরে পর হানি॥
রজনী উজাগরে রহিবি অগোর। গোপালদাস যশ গাওব তোরি॥

(প-ক-ত, ১০৭৬)

(ছ) লুনির পুথলি নব বালা। কোমল শিরসিক (সিরিশকি) মালা॥
মাধব নিবেদলুঁ তোয়। মরিজাদ রাখবি মোয়॥
ঘুমলে জা(গা) নহি যায়। নিজপতি ছায়া নাহি চায়॥
বলে ছলে আনহুঁ কান। আলপে দেবি সমাধান॥
দুতিক কাতর ভাষ। কহতহিঁ গোপালদাস॥

(জ) আলুয়াইয়া কবরি ভার দুই করে অলঙ্কার
ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে।
প্রাণনাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সঘনে কম্পয়ে কলেবর (রে)॥
প্রাণের সহচরি আজু কৈল দেখি আনভাতি।
যা দেখিলে মোর আনন্দ বাঢ়িত গ
তাহা দেখি জলে কেনে ছাতি॥ ধ্রু॥
সারি সুক পিকুগন কেনে করে উচাটন
দিবস আন্ধার কেন বাসি।
হিয়ার মাঝারে মোর কেমন জানি করে গো
মাধব যে দিন হইলা পরবাসি॥
ধেনুবৃন্দ অন্য মন হাম্বা রব অনুক্ষণ
চঞ্চলস্বভাব কেন দেখি।
বনের জত মৃগিগন সে কেন কান্দয়ে গো
ঝুরে কেন পুষণীঞা পাখি॥
প্রিয় নর্ম্মসখাগনে নাহি দেখি কাননে
মুরলি সবদ নাহি সুনি।
ময়ূরের ঘন নাদ সুনি কেন পরমাদ
বজর সমান সুনি ধ্বনি॥
সেই পক্ষ কলরব বিপরিত সুনি সব
ডাহুক ডাহুকি ঘন ডাকে।
হংস সারস বানী শ্রবনের জালা জানি
এত কেনে হইল বিপাকে॥
সিতল জমুনার জল পুন দেখি গরল
কালিয় আইল হেন বাসি।
যে চান্দ দেখিলে মোর আনন্দ বাড়িত গো
সে কেন গরল বরসি॥

মন্দ সমীরণ সেহ দহে অগ্নি সম * *
চন্দন গরল সম লাগে।
বিসম মদন বানে কি লাগি পরানে হানে
হৃদয়ে দারুন সেল জাগে॥
নৃপ (নীপ) তরু কুঞ্জবন তাহা দেখি উচ্চাটন
শিতল গরল বিষ জ্বালা।
কোমল শিরসি (শিরীষ) দল পরসে দহে কলেবর
কুসুমে বিষম শরজ্বালা॥
বিসম বরিখা কাল সেহ হইল জঞ্জাল
কত দুখ সহিবারে পারি।
দারুন মদনসর হিয়া করে জর জর
অবলা কেমনে প্রাণ ধরি॥
মেঘ চাহি প্রাণ ফাটে পথিক না দেখি বাটে
অনুক্ষণ উচ্চাটন হিয়া।
তাহেত চাতকি পাখি ঘন হেরি ঘন ডাকি
উদ্দীপন করায় প্রিয়া প্রিয়া॥
অভরন যৌবন হেরি প্রাণ ধরিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
জত ছিল অনুকুল সেহ হইল প্রতিকুল
নিলজ পরাণ নাহিঁ বাহিরায়॥
সেই মোর সরোবর সেই কুঞ্জ মনোহর
সেই মোর গোবর্দ্ধন গিরি।
প্রিয়ার নিকটে মোরে কত সুখ দিত গো
সে কেনে হইল মোরে বৈরি॥
প্রভুর হাতের নীপতরু সেহ দেখি ফুল ধরু
তাহা দেখিলে প্রাণ ফাটে।
জে সুখ যেখানে হয়ে তাহা দেখি প্রাণ যায়ে
সে হেন বান্ধা জমুনার ঘাটে॥
ঘর দেখি সুন * * সুন্য দেখি ত্রিভুবন
নিরন্তর বিদরে মোর হিয়া।
জে খাট পালঙ্ক হেরি ধৈরজ ধরিতে নারি
মন ঝুরে পথিক দেখিয়া॥
সরত্ত নিশির কাল সেহ মোর হইল কাল
দারুণ মদন সনে বাদ।

তাহে ঋতু বসন্ত সেহ হএ দুরন্ত
ভ্রমর নিকর পরমাদ ॥
অনিল মলয়গতি তাহে হইল বিপরিতি
সেহ দুখ দেই নিরন্তর।
একে সে অবলা জাতি তাহে বাদ কুলবতি
কেমনে হইব স্বতন্তর ॥
শ্যামল তমালরূপ সেহ দেই মহাদুখ
পিয়ার ভরমে হেরি তায়।
তাহার পরস লাগি তরুতলে জাও সখি
দেখিতে আনল উঠে প্রায় ॥
সুরঙ্গ রঙ্গন মালা প্রভু মোর গলে দিলা
কদম্ব মঞ্জরি দিলা কানে।
নিজ করে মুছে ঘাম তিলক দেন অনুপাম
সেহ গুন পাসরি কেমনে ॥
বান্ধেন কবরি ভার নানা ফুল গাঁথি হার
খোঁপার বিনান কত ভাঁতি।
সে হেন প্রিয়ার গুন হিয়ায় বিন্ধিলে ঘুণ
কেমনে ধরিব দারুণ ছাতি ॥
নানা কুঞ্জে নানা বনে দেখিয়া পড়য়ে মনে
সেই কেনে নিরবধি জাগে।
যে রতি আরতি যত বুঝিতে না পারি তত
হিআয় হিআয় জেন লাগে ॥
সে মধুর আলাপনে সুনিব কি য়ে শ্রবণে
নয়নে দেখিমু চান্দমুখ।
সে অঙ্গ পরিমলে অঙ্গে লাগি রস * *
পরশে সিতল হবে বুক ॥
আর কি আমার প্রিয়া দেশে না আসিব গো
আর না বসিব মোর কোলে।
হিয়া কাটিয়া মোর তনু বাহিরায় গো
স্থির হইব কার বোলে ॥
সেই সখা সেই সখি সেই সব পশু পাখি
সেই সকল দেখি জাল।
এক চান্দ বিহুনে যেন কি করিব তারাগন
কেমনে বঞ্চিব নিশিকাল ॥

এ হেন দারুন হিয়া কেমন পরবোধ দিয়া
নিবারিব কোন অবিরোধে
উদ্দীপন বিরহ নারী ধৈরজ ধরিতে নারি
মন ঝুরে রামগোপাল দাসে ॥

[৭] কবিশেখর—

(ক) বসনে বসনে লাগিবে লাগিয়া একুই রজকেরে দেয়।
মোর নামের আদি আখর * * * তাই সে যদাই লেয় ॥

(খ) কানু বিরস কথি লাগি। কি মোর করম অভাগি ॥

(পরে "গোপাল বিজয়" হইতে যে কয় ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই কবিশেখরের প্রণীত বলিয়াই মনে হয়। এই কবিশেখর ও রায়শেখর একই ব্যক্তি।)

[৮] কবিরঞ্জন—

(ক) নব দর্শনে নবিন নারী। হৃদয় বুঝল গতি নারি ॥ (নিবারি ?)
কাহিনী কহত লাগহুঁ লাজ। নয়নে নয়নে গঢ়ল কাজ ॥

(খ) গুরুয়া গরজে ঘন গগনে লাগল মন কুলিশ না করু মুখ বন্ধ।
তিমির অঞ্জন জল ধারে ধোয়ে হেন তেঁ অনুমানই সন্ধ ॥

(গ) দৃঢ় বিসোয়াসে পন্থ নেহারি। যামুন কুঞ্জে রহল বনমালি ॥
উহু ধ্বনি সহজই পদুমিনি জাতি। তোহারি বিলাস উচিত নহে রাতি ॥
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ। অহে অভিসারে দ্বিগুণধিক রঙ্গ ॥
ভুখিল জল জব না পায় বয়ান। বিফল ভোজন দিন অবসান ॥
আরতি রতিহুঁ না হয়ে সমওল। গাহক আদর সব বহু মূল ॥
পদুমিনি নায়রি যদুমণি নাহ। কহে কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥

(ঘ) কি কহব মাধব পিরিতি তোহারি। তুয়া অভিসারে না জানিয়ে বরনারি ॥
পন্থ পিছরে নিসি কাজর কাঁতি। পাথরে (পাঁতরে) ভৈ গেল দিগ ভরাতি ॥
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি সঙ্ক। সুন্দরী হৃদয়ে নপুর পরিবঙ্ক ॥

কবিরঞ্জন ঠাকুর—

(ঙ) চরণ নখ রমণিরঞ্জন ছান্দ। ধরণী লোটাঅল গোকুলচান্দ ॥
চরকি চরকি ঝরু লোচনে লোর। কত রূপে মিনতি করল পঁহু মোর ॥

(চ) উদসল কুন্তল ভারা। গলে দোলে মোতিম হারা ॥
মুরতি শৃঙ্গার লখিমি অবতারা। যমুনা জলে জেন দুধকি ধারা ॥
দারুণ মদন বিকারা। কামিনি করত পুরুখ ব্যবহার ॥
কিঙ্কিণি রুণরুণি বাজে। জয় জয় ভিণ্ডিম মদন সমাজে ॥
রসিক সিরোমনি কান। কহে কবিরঞ্জন ভান ॥

[৯] যদুনাথ দাস ঠাকুর—

সজনি ও বোল বোলসি জানি মোরে।
যে বন্ধু লাগিয়া এতেক পরমাদ ছাড়িতে বোলহে তারে॥

[১০] শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর—

কোন দেশে ছিল আগো মাগো।
কালা বোলিতে মোর মুখে পড়িত লালো॥
ইবে কেনে কাজে নাহি লাগি॥ ধ্রু॥

কোনের বহুআরি আমি বাড়ির বাহির নহি মোরা
কালা দেখিতে ভেল বেলা।
আচেষ্ট ঘুমের বেলে স্বামির সিজের কোলে
সপনে উঠিয়া দেখি কালা॥

পাকে বান্ধা ঘরে তুমি পরকে নামাইয়াছ
তোমার পাও নাহি তিতে।
লোচন বোলেন দিদি এ দুখে আমি কান্দি
উঠিতে না পাবা এ না চিতে॥

[১১] নৃপ উদয়াদিত্য—

এমন বন্ধুরে মোর জে জন ভাঙ্গায়। এ হেন অবলার বধ লাগিবেক তায়॥

[১২] জ্ঞানদাস ঠাকুর—

(ক) না মরিয়ে ননদিনি মুন্দি দুইটি আঁখি। এ ভর দুফরে জেন স্যামরূপ দেখি॥

(খ) তিলে তেআগিলুঁ পতি খুরধার। শ্রবণে না শুনহুঁ (লুঁ) ধর্ম্ম বিচার॥

(অ-প-র, ৩৫)

(গ) আজু অবধি দিন ভেল। কাক নিকটে কহি গেল॥
সঘনে খসত্র নিবিবন্ধ। বাম নয়ন করু স্পন্দ॥
এ লক্ষণ বিফল না যাব। মাধব নিজ ঘরে আওব॥

—(প-ক-ত, ১৯৭৮)

[১৩] বড়ু চণ্ডীদাস ঠাকুর—

(ক) কি না হৈল্য মোরে সেই কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
নবীন পাউসের মীন মরন না জানে।
নব অনুরাগে চিত নিরোধ না মানে॥
খাইতে সোআস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে
নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে॥

জে না জানয়ে ওনা রস সে না আছে ভাল ॥
হৃদয়ে রহল মোর কানুপ্রেমসেল ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপনা আপন কৈলুঁ পর ॥ (২৭ পত্রাঙ্ক, আত্মদৈন্য)।

বড়ু চণ্ডীদাস—

(খ) আজু গোকুল সুন্ত ভেল। হরি কিয়ে মধুপুর গেল ॥
রোদতি পঞ্জর সুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥—(প-ক-ত, ১৬৩৮)

(ভবন বিরহ) গ্রন্থকারের নিজোক্তি, ৩৩ পত্রাঙ্ক,—

ভবন বিরহিনির দুখ কহনে না জায়। অমৃতে সিঁচিলে হিয়া নাহিক জুড়ায় ॥

[১৪] শ্রীমত প্রভু (শ্রীরতিপতি ঠাকুর)—

এতদিন বুঝলু তুয়া হৃদয় নিঠুর। রাই উপেক্ষি আয়লি এত দূর ॥
অব তুহু একলি রহসি বন মাঝ। তোয়ে নাহি সম্ভবে এমন অকাজ ॥
সময় উচিত করিএ জদি মান। আঁচরে ঝাপিয়ে আপন বয়ান ॥
এক দিনে শুতিয়ে চিত সমাধি। সাধীয়ে বাদ তঁহি ঝাখএ উপাদি ॥
অনুগত তুয়া বিনু না বোলয়ে আন। করে ধরি বলে দুতি করহ পয়ান ॥
রতিপতি দাস করয়ে পরনাম। দুতি নহে ইহোঁ দুহুঁক পরাণ ॥

[১৫] বল্লভ চতুর্দ্ধরীণ—

অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি কহতহিঁ কবে হব রাইক সঙ্গ ॥
—(প-ক-ত, ৭৭৩)

[১৬] শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—

তাম্বুল বদনে ইত্যাদি।

[১৭] শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—

উলসিত মঝুহিয়া আজু আওব প্রিয়া দৈবে কহল সুভবানি।
শুভ সুচক জত নিজ অঙ্গে বেকত অতএব নিশ্চয় করি মানি ॥
—(প-ক-ত, ১৭০৪)

[১৮] নৃসিংহ ভূপতি—

স্যামসুন্দর সুঘড়সেখর কোরে মিলল রে।

[১৯] শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য ঠাকুর—

ঘন মেঘ বরিখয়ে বিজুরি চমকে। তাহা দেখি প্রাণ মোর হরহরি কাপে ॥
ছোড় ছোড় আচল নিলজ মুরারি। লাজ নাহিক তোর হাম পরনারি ॥

[২০] শ্রীনরোত্তম ঠাকুর—

রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয়া গিরিধর মধুর মধুর চলি জায়।
আগে পাছে সখিগণ করে ফুল বরিসন কেহো কেহো চামর ঢুলায়॥

—(প-ক-ত, ১০৭৪)

[২১] শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুর—

(ক) নিজ নিজ মন্দিরে চলয়িতু পুনঃ পুনঃ দুহুঁ মুখচন্দ নেহারি।
অন্তরে উছলল প্রেম পয়োনিধি লোচনে পুরল বারি॥—(প-ক-ত, ৬৬০)

(খ) বৃন্দাবনে রাধাকানু কেলি বিলাস।
দুহেঁ সুভ অভিসারি খেলে পাশা সারি কৌতুকে হাস পরিহাস॥

পদকর্ত্তৃগণের নামের বর্ণানুসারে সূচী

[১] অজ্ঞাত পদকর্ত্তা
[২] উদয়াদিত্য (নৃপ)
[৩] কবিরাজ ঠাকুর (গোবিন্দদাস)
[৪] কবিশেখর
[৫] কবিরঞ্জন
[৬] গোপাল দাস
[৭] গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
[৮] গোবিন্দ আচার্য্য
[৯] জ্ঞানদাস
[১০] নরোত্তম ঠাকুর
[১১] নৃসিংহ ভূপতি
[১২] বড়ু চণ্ডীদাস
[১৩] বল্লভ চতুর্দ্ধরীণ
[১৪] বিদ্যাপতি
[১৫] মহাজনস্য (অজ্ঞাত পদকর্ত্তা)
[১৬] যদুনাথ দাস
[১৭] রতিপতি ঠাকুর
[১৮] রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী
[১৯] লোচনানন্দ
[২০] শিবানন্দ
[২১] শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য।

আমাদের মন্তব্য

রসকল্পবল্লীর মধ্যে যে কয়জন পদকর্ত্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও পদ তুলিয়া দিলাম। ইহার দ্বারা পদাবলী-সাহিত্যের অন্ধকার পথে কথঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত হইতে পারে। বল্লভ চৌধুরী, রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের নাম পদাবলী-সাহিত্যে নূতন। পদকল্পতরুর বল্লভ ভণিতার পদের মধ্যে ইঁহাদের পদ আছে কি না অনুসন্ধান আবশ্যক। শ্রীরতিপতি ঠাকুরের নামও নূতন পাইলাম। তবে রসমঞ্জরীর "কুঞ্জে কুসুম হেরি পন্থ নেহারই সহচরী মেলি আনন্দে" পদটী ইহাঁরই রচিত বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে "উলসিত মঝু হিয়া" এই ১৭০৪ সংখ্যক পদটী গোবিন্দ কবিরাজের বলিয়া সম্পাদক রায় মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু রসকল্পবল্লীতে এই পদটী স্পষ্টই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নামে পাওয়া যাইতেছে। "অনুক্ষণ

কোণে থাকি" পদটী (৮৩৯ সং) পদকল্পতরুতে অজ্ঞাত পদকর্ত্তার নামে চলিয়া গিয়াছে, এই পুথি হইতে জানিলাম, পদটী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের রচিত। আচার্য্য ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত তিনটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। (সংখ্যা ৭৯০, ৩০৭২ ও ৩০৭৩)। ইহার মধ্যে 'বদনচান্দ কোন কুন্দার কুন্দিলে'' (৭৯০) পদ ভক্তিরত্নাকরে ও অনুরাগবল্লীতে শ্রীনিবাস ঠাকুরের রচিত বলিয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র শ্রীকবিরাজ ঠাকুর, কবিরাজ মহাশয়, অথবা কবিরাজ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। কবিরাজ ঠাকুরের কতকগুলি পদ নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে।

বিদ্যাপতির কয়েকটী পদই নূতন মনে হইল। ' দূতি তুহুঁ দারুণ সাধিলে বাদ" পদটী রসমঞ্জরীতেও পাইয়াছি,—কিন্তু মাত্র ঐ দুইটী কলি। এ পদটী পদকল্পতরু বা নগেনবাবুর সংগ্রহে পাওয়া গেল না। "এত দুখ দেওসি মদন" পদটী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-সংকলিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে রূপান্তরে পাওয়া গিয়াছে। "সজনি কৈছে জিঅব কাহ্নু" পদটী রায় মহাশয় বাঙ্গালা পদকর্ত্তা রায়শেখরের বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদটী পদকল্পতরুতেও পাওয়া যায়। আরম্ভ এইরূপ—

"তিল এক নয়ন এত জিউ না সহ না রহু দুহুঁ তনু ভীন।"

ভণিতায় কবিশেখরের নাম আছে। এ পদের প্রকৃত ভণিতা পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বিদ্যাপতি ভণে ভাব না জানিয়ে সোই বড়ই বিপরীত॥"

বিদ্যাপতির "বিদগধ নাগরী" পদটী অজ্ঞাত পদকর্ত্তার নামে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর মধ্যে আছে। "বিদগধ নাগরী" প্রভৃতি কলি দুইটীর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দুইটী কলিতে পদ আরম্ভ,—

"হরি গলে লাগল চম্পক মালা। পুলকিত বাহু বিহসি রহু বালা॥"

বাকী চারিটী কলি একরূপ।

জ্ঞানদাসের মাত্র তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। একটী পদ পদকল্পতরুতে পাই। অপর দুইটী পদ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে আছে—সংখ্যা ২৮ ও ৩৫। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'' পদটী আমরা জ্ঞানদাসের নামেই চালাইয়া আসিতেছি। গোপালদাস মহাজনের পদ বলিয় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, জ্ঞানদাসের নাম দেন নাই। কারণ কি ?

কবিরঞ্জনকে লইয়া বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহার কয়েকটী বিখ্যাত পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। যেহেতু পদের রচনা উৎকৃষ্ট, সেই হেতু তাহা বাঙ্গালী পদকর্ত্তার রচনা হইতে পারে না—ইহা কোনও যুক্তি নহে। একটা মৈথিল শব্দ, দুইটা প্রয়োগ-পদ্ধতি—যাহা ব্রজবুলির মধ্যেও থাকা আশ্চর্য্য নয়, বরং স্বাভাবিক, তাহাও তেমন জোর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রসকল্পবল্লীর প্রণেতা গোপালদাস গ্রন্থ-মধ্যে শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যে কবিরঞ্জনের নাম করিয়াছেন, এবং রঘুনন্দন শাখা-নির্ণয়ে এবং যাঁহার বংশগৌরবাদি প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি নিজের গ্রন্থমধ্যে শ্রীকবিরঞ্জন ঠাকুর বলিয়া যাঁহার পদ উদ্ধৃত করিতেছেন, কোন্ প্রমাণে বলিব—সে পদ মিথিলার

বিদ্যাপতির? "চরণ নখ রমণীরঞ্জন ছান্দ" পদটীর মাত্র কয়েকটী কলি গোপালদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরী গ্রন্থে ভণিতা সহ সেটী সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়াছেন। এই পদটী প্রাচীন পদসংগ্রহ পদকল্পলতিকায় (সংগ্রহ ১৭৭৫ শকাব্দা) কবিরঞ্জনের ভণিতায় উদ্ধৃত আছে। এখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আপত্তি করিতেছেন,—পদকল্পতরু গ্রন্থে যখন বিদ্যাপতি-ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ পদ কবিরঞ্জনের হইতে পারে না। পদকল্পতরু অপেক্ষা যে রসকল্পবল্লী বা রসমঞ্জরীর প্রমাণ বলবত্তর, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে? বিদ্যাপতির যে কবিরঞ্জন উপাধি ছিল, মূলে ত তাহাই প্রমাণিত করা আবশ্যক। বাঙ্গালায় মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বড় জোর শতখানেক পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। কবিরঞ্জন যে বাস্তবিকই একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার পদ পড়িয়াই বুঝা যায়। অন্যথায় রামগোপাল দাস তাঁহাকে বিদ্যাপতি ও কালিদাসের সঙ্গে তুলিত করিতেন না। সুতরাং আমাদিগকে এখন পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাপ্য কবি-সম্মান তাঁহাকে দিতে হইবে। "উদসল কুন্তলভারা" পদটীর পূর্ব্বে পদকর্ত্তার নামের জায়গা কাটা আছে। পূর্ব্বে বোধ হয়, ভুলক্রমে অন্য নাম লেখা হইয়াছিল, সে নাম তুলিয়া দিয়া কবিরঞ্জন লেখা হইয়াছে। "দেবা চকেবা"---কলি দুইটী এ গ্রন্থে নাই। কবিরঞ্জনের সঙ্গে "জস রাখা" কথাটা বুঝিলাম না (গ্রন্থের মধ্যে খণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের পরিচয় মধ্যে)। 'যশরাজ খান' কি এইরূপ কিছু হইবে না-কি? কবিরঞ্জনের কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের দুইটী পদ পাওয়া যায়, কিন্তু দুইটীই সন্দেহজনক। প্রথম পদটীর পদকর্ত্তার নামের জায়গাটী কাটা এবং তাহাতে অস্পষ্ট ভাবে 'বড়ু চণ্ডিদাস ঠাকুর' লেখা। কেহ অন্য নাম তুলিয়া এই নাম বসাইয়াছে অথবা 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামটাই তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপে কাটিয়াছে, কিছুই বলিবার উপায় নাই। যে ভণিতাহীন পদটী 'আত্মদৈন্য' নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে রূপান্তরে চণ্ডীদাসের নামেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদে পদকর্ত্তার নাম সুস্পষ্ট, কিন্তু যে পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এখন সে পদ বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। গোপালদাস প্রথম কলি দিয়াছেন, "আজু গোকুল সুন্য ভেল"। বিদ্যাপতির নামের পদের আরম্ভ, "হরি কি মথুরাপুর গেল"। শ্রীযুক্ত নগেনবাবু হয় ত ইহাকেই একটু মৈথিল করিয়া লইয়াছেন! পদকল্পতরুর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা চলিবে না। তবে যদি মিথিলায় বা নেপালের তালপত্রে কিছু লেখা থাকে, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোনো পদ পাওয়া যায় না। অথচ জ্ঞান, গোবিন্দ প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের পদের অভাব নাই। ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। ক্ষণদার পূর্ব্ববিভাগ মাত্র সংকলিত হইয়াছিল; কিন্তু উত্তরবিভাগের জন্য কেবল চণ্ডীদাসকেই রাখা হইয়াছিল, ইহা কোনো কাজের কথা নয়। সব রসেরই পদ ক্ষণদায় আছে, সুতরাং চণ্ডীদাসকে রাখিতে অসুবিধা না থাকিবারই কথা। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের ঝগড়াই বা কি থাকিতে পারে? রসবিচারে গুরুতর মতবিরোধ হইলেও

পদ উদ্ধারে বাধা ঘটিবে কেন? বিশেষ স্বর্গীয় কবির সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ যে এতটা অবিচার করিয়াছেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। তবে কি চণ্ডীদাসের পদ সে সময় পাওয়া যাইত না? মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ এত শীঘ্রই বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া গিয়াছিল? এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং বিস্তৃততর আলোচনা আবশ্যক।

রসকল্পবল্লীতে "বড়ু চণ্ডীদাস" নাম দেখিয়া ভরসা হইতেছে, কবির নাম লোকে ভুলে নাই, তবে পদ বিরল-প্রচার হইয়াছিল। কীর্ত্তনিয়াদের মুখে অথবা কাহারও নিজের সংগ্রহে লেখা যাহা পাওয়া গিয়াছিল, পরে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। গোপালদাসের পূর্ব্বেই দীন চণ্ডীদাসের পদ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত; "বড়ু চণ্ডীদাস" নাম দেখিয়াও এইরূপই অনুমিত হয় যে, উপাধি সহ কবিকে চিহ্নিত করিয়া রাখার দরকার হইয়াছিল। সেরূপ প্রয়োজন না থাকিলে কেবল "চণ্ডীদাস" বলিলেই যথেষ্ট হইত। কবিরাজ ঠাকুর, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নাম দেখিয়াও বুঝা যায় যে, গোপালদাস সকলকেই এই ভাবে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে কতকগুলি পদ "মহাজনস্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গোপাল দাস এই পুথি লিখিয়াছিলেন, সেই সময়েই অনেক পদের ভণিতা ছিল না। পুত্র পীতাম্বরও নিজের রসমঞ্জরী গ্রন্থে কয়েকটি পদ "কস্যচিৎ" বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। সে সংগ্রহে কিন্তু ইহার একটা রূপ পাওয়া যায়। তাহাতে অপর কলিগুলির সঙ্গে ইহার বেশ সামঞ্জস্যও রক্ষিত হইয়াছে। কথা উঠিতে পারে যে, এই ভাবে বেওয়ারিশ টুকরা-টাকরা পদ জোড়া-তাড়া দিয়াই হয় ত চণ্ডীদাসের পদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহা যে সর্ব্বত্র হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই কথা বলা যায় যে, অজ্ঞাত পদকর্ত্তাগণের অপর পদগুলিও তাহা হইলে বাদ পড়িত না। তাহার মধ্যেও এমন অনেক সুন্দর সুন্দর পদ আছে, যাহা চণ্ডীদাসের নামের পক্ষে বেমানান্ হইত না। তবে দুই একটী যে, এই ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কারণ—অবশ্যই কেহ কোনরূপ প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন, যাহার বলে অপর পাঁচ জনেও সেট চণ্ডীদাসের বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এ বিষয়েও বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। গান-রচয়িতাকে ভুলিয়া যাওয়া লোকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কোন্ কবিতার রচয়িতা কে, কোথা হইতে পদ সংগৃহীত, সে সকলের খোঁজ কে রাখে? কেহ কেহ যে ইচ্ছা করিয়াই স্বরচিত পদে ভণিতা দেন নাই, এমন অনুমানও করা যায়। যাহা হোক, পদকল্পতরু-সংকলনের সময় প্রায় দুই শত গানের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। গোপালদাস যে পদগুলি "মহাজনস্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি যে পুরাতন, এ কথা বলা চলে। ইহার মধ্যে একটি পদ—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন পুঁথিতে আবার যদুনাথের ভণিতা পাওয়া যায়। "মহাজনস্য" বলিয়া "বিজন বনে বসে" এই যে পদটি কল্পবল্লীতে পাই, পদকল্পতরুতে (৬৪৯) এই পদ গোবিন্দদাসের নামে চলিতেছে; পদকল্পতরুতে আরম্ভ,—"ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।"

আমরা যে পদগুলি অজ্ঞাত পদকর্ত্তাগণের বলিয়া লিখিয়াছি, সেগুলির পিছনে

"মহাজনস্য" বা ঐরূপ কিছু লেখা নাই, কোন পদকর্ত্তার নামও নাই, অথচ উহার সবগুলিই যে গোপালদাসের লেখা নয়, তাহার প্রমাণ—উহার মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজের একটি পদ রহিয়াছে,—

"মুরলি মিলিত অধর নব পল্লব "—(প-ক-ত, ৬২১)

আর একটি পদ বিদ্যাপতির—"রাতি ছোড়ি ভিরু রমণি"। এই পদগুলি না থাকিলে হয় ত সন্দেহ করা চলিত। অবশ্য উহার মধ্যে দুইটি পদ গোপালদাসের স্বরচিত; রসমঞ্জরীর মধ্যে পূরা পদ পাওয়া গিয়াছে। "মধুপুর পন্থিক বিনয় করি তোয়" —এই পদটি অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর মধ্যেও আছে। অন্য পদটি "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে" পদের মধ্যের দুইটী কলি। এ পদটীও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে আছে। অন্যান্য পদগুলি কোন্ কোন্ পদকর্ত্তার রচিত, হয় ত অনুসন্ধান করিলে পরে সন্ধান মিলিবে; তবে সে পদগুলি যে গোপালদাসের রচিত, ইহা কোন মতেই বলা চলে না। ইহা গ্রন্থকারের পয়ার ত্রিপদীও নহে। এগুলি যে পদ, তাহা রাগ-রাগিণীর উল্লেখে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের মনে হয়, এগুলিও বহু বিখ্যাত, সে কালে প্রচলিত পদের অংশ-বিশেষ। হয় ত কোনটার ভণিতা ছিল, হয় ত বা ছিল না; গোপাল দাস উদাহরণ-স্বরূপে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। অপরের ভণিতাহীন পদ তিনি প্রায়ই তুলিয়াছেন, কিন্তু নিজের পদ প্রায় সবগুলিই ভণিতা সহ সম্পূর্ণই লিখিয়া গিয়াছেন। যে দুইটী অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা পুত্রের পুথিতে পূর্ণ হইয়াছে। অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদের একটী আজও প্রায় ভণিতাহীন ভাবেই চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে; পদকল্পতরুর ৮২৮ সংখ্যক পদের ত্রিপদীর সঙ্গে মিশিয়া এই কয়টী কলি—"তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল" ইত্যাদি—একটা খিচুড়ীর সৃষ্টি করিয়াছে।

রসকল্পবল্লী হইতে নিম্নলিখিত পদকর্ত্তৃগণেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়:—

বল্লভ চৌধুরী---পদকল্পতরুর ভূমিকায় রায় মহাশয় এই পদকর্ত্তার কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি "বল্লভ" ভণিতার পদগুলি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কোন (বল্লভ-নামা) শিষ্যের রচিত মনে করিয়াছেন। আর রাধাবল্লভ-ভণিতার পদ সুধানিধি মণ্ডলের পুত্র রাধাবল্লভের রচিত বলিয়াছেন। কিন্তু রসকল্পবল্লী হইতে জানা যাইতেছে, একজন বল্লভ পদকর্ত্তার চৌধুরী পদবী ছিল। আমাদের মনে হয়, উদ্ধব দাস এই চৌধুরী বল্লভেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীল রাধাবল্লভ চাঁদরায় প্রেমার্ণব চৌধুরী শ্রীখেতরী-নিবাস॥" (প-ক-ত, ৩০৯২)

পদকল্পতরুর রাধাবল্লভ ভণিতার পদগুলি ইহাঁরই রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থে সুধানিধি মণ্ডলের (পত্নী শ্যামপ্রিয়া) পুত্র "রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্রে"র উল্লেখ পাই। কিন্তু রসকল্পবল্লীতে চৌধুরী বল্লভের পদ পাইতেছি, এদিকে নরোত্তম-শাখায় রাধাবল্লভ চৌধুরীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পদকর্ত্তা যে নরোত্তম-ভক্ত ছিলেন, পদের মধ্যে সে পরিচয়েরও অভাব নাই। সুতরাং ইনিই পদকর্ত্তা—এইরূপই অনুমান হইতেছে। যদি মণ্ডল রাধাবল্লভ পদকর্ত্তা হন, তবে দুই জনের পদ মিশিয়া গিয়াছে। এই চৌধুরী বল্লভের পদের যে দুইটী কলি রসকল্পবল্লীতে উদ্ধৃত

হইয়াছে, পদকল্পলতিকায় সেই দুইটি কলি সহ পদটী বল্লভদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পদের আরম্ভ,—"সজনি কো কহু প্রেমতরঙ্গ।" (প-ক-ল,৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পদকল্পতরু হইলেই তাহাকে প্রামাণ্য বলা চলিবে না। এক্ষেত্রে পৌনে তিন শত বৎসরের পুথির সঙ্গে পদকল্পলতিকার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এদিকে পদকল্পতরুর গোবিন্দদাস ভণিতার ৭৭৩ সংখ্যক পদের মধ্যে সেই দুইটী কলি রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে। পদের আরম্ভ—"আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরি দরশ পরশ মঝু হোয়।" তৃতীয় ও চতুর্থ কলি দুইটী এইরূপ,—

"সজনি না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ। রাইক কোরে চমকি হরি বোলত কবে হবে তাকর সঙ্গ॥"

ইহারই পরে ৭৭৪ সংখ্যক পদ রাধাবল্লভ দাসের ভণিতাযুক্ত। বল্লভ ভণিতার কতকগুলি পদ বংশীলীলা-প্রণেতা শ্রীবল্লভের রচিত বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দদাসের একটী পদে শ্রীবল্লভের নাম পাওয়া যায়—

"গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতী রসমরিজাদ॥"—(প-ক-ত, ২৩৪)।

১৪১৬ শকাব্দে বংশীবদনের জন্ম। ইঁহার পুত্র চৈতন্যদাস, তৎপুত্র শচীনন্দন, তৎপুত্র শ্রীবল্লভ। অনেকের মতে ১৪৫৯ শকে গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম। ১৪৯৯ শকাব্দে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ, সুতরাং কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র হইয়াছিল, এবং পুত্র পৌত্রেরও এই হিসাবে জনকত্ব ধরিলে ১৪৯৯ শকাব্দে শ্রীবল্লভ ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক, এইরূপ অনুমান করা যায়। গোবিন্দদাস দীক্ষাগ্রহণের পরে পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। বংশীবদনের গৌরবান্বিত বংশে জন্মিয়া এবং কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া বল্লভ ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাহার পরে বন্ধুত্বসূত্রে বল্লভ গোবিন্দের বন্দনা পদ লিখিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর), এবং গোবিন্দ তাঁহার স্বরচিত পদে বল্লভের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সব দিকেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। হইতে পারে, এই বল্লভ শ্রীনিবাস আচার্য্য বা নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। বল্লভ ভণিতার পদে আচার্য্য ও ঠাকুর মহাশয় উভয়েরই উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্যদেব, ঠাকুর মহাশয়, কবিরাজ রামচন্দ্র ও কবিরাজ গোবিন্দের তিরোধানের পরও বল্লভ জীবিত ছিলেন, এবং শোকসূচক পদ রচনা করিয়াছিলেন; পদকল্পতরুর ২৯৮১—৮২ ও ৮৩ সংখ্যক পদ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে "পূর্ব্বপূর্ব্বগীত-কর্ত্তৃগণশ্রীচরণস্মরণম্" বলিয়া যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে "জয় জয় শ্রীবল্লভ পরমাদ্ভুত প্রেমমূরতি পরকাশ" বলিয়া বোধ হয়, এই শ্রীবল্লভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া অন্য বল্লভের কল্পনা করিতে যাওয়া কত দূর সঙ্গত, সুধীগণ বিচার করিবেন।

রাধাবল্লভ বা বল্লভ ভণিতার পদের মধ্যে রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পদও আছে। এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। পদকর্ত্তা ঘনশ্যামের

(প-ক-ত,২৪২১) "উজল হার উর পীত বসনধর ভালহি চন্দনবিন্দু"—এই পদের ভণিতায় এইরূপ উল্লেখ পাই,—

"ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় পয়মাণ ॥"

অনুমান হয়, এই মদন রায় কল্পবল্লী-রচয়িতা গোপালদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর। গোপালদাস ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী।" নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের পার্ষদ চিরঞ্জীবের পুত্র গোবিন্দদাস, তৎপুত্র দিব্য সিংহ, তৎপুত্র ঘনশ্যাম—চতুর্থ পুরুষ। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি হইতে মদন রায় পঞ্চম পুরুষ। উভয়েই শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। মদনের কনিষ্ঠ, গোপালদাসের গুরু রতিপতি ঠাকুর, নরহরির জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ হইতে ষষ্ঠ পুরুষ। আশা করি, এই হিসাব দেখিয়াও পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ ও শ্রীবল্লভের সময় সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিবেন না। রঘুনন্দনের পৌত্রের নামও মদন। ঘনশ্যামের পদে ইহারও নাম উল্লিখিত থাকিতে পারে। ইনিও প্রায় ঘনশ্যামের সমসাময়িক। রায় উপাধি দেখিয়া কিন্তু সন্দেহ হয়। নরোত্তম-শিষ্য একজন মদন রায় ছিলেন।

"নৃসিংহ ভূপতি" নামক একজন পদকর্ত্তার উল্লেখ কল্পবল্লীর মধ্যে পাওয়া যায়। "পূর্ব্বপূর্ব্ব পদকর্ত্তৃগণচরণস্মরণে" বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,—"জয় জয় শ্রীনরসিংহ কৃপাময় জয় জয় বল্লবীকান্ত"। নরোত্তমের স্বগণ গঙ্গাতীরবর্ত্তী পক্বপল্লী-নিবাসী রাজা নরসিংহ যে পদকর্ত্তা ছিলেন এবং নৃসিংহভূপতি বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে, কল্পবল্লী দেখিয়া এইরূপই অনুমান হয়। আশা করি, নৃসিংহ কবিরাজের দোহাই দিয়া অতঃপর ইহাঁকে কেহ অস্বীকার করিবেন না।

ভক্তিরত্নাকরে ও প্রেমবিলাসে রূপ ঘটকের উল্লেখ আছে। জাজিগ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। আমাদের মনে হয়, এই রূপ ঘটক মহাশয়ই রামগোপাল দাসকে গ্রন্থসন্ধান দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য—"ঘটক শ্রীরূপ নাম রসবতী রাইশ্যাম লীলার ঘটনা রসে ভাস" (প-ক-ত, উদ্ধবদাসের পদ, ৩০৯২)। বৈষ্ণবদাসও বন্দনা করিয়াছেন,—"জয় জয় রূপ ঘটক ঘট রসময়" (১৮ সং); কিন্তু ইহাঁর রচিত কোন পদ পাওয়া যায় না। ইনি বোধ হয়, রঘুনন্দন-শিষ্য চক্রপাণিকে দেখিয়াছিলেন ; কারণ, রঘুনন্দন ও নরোত্তম সমসাময়িক। তাহা হইলে ঘটক মহাশয় চক্রপাণি হইতে গোপালদাস পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ দেখিলেন। আর যদি চক্রপাণিকে না দেখিয়া থাকেন, অন্ততঃ চারি পুরুষ দেখিয়াছেন, এ কথা বলা যায়।

শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুর কে ? রসকল্পবল্লীতে ইহাঁর দুইটী পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে "শিবানন্দ বাণীনাথ হরিদাস আচার্য্য" নাম পাই। ইহাঁরা কাহার শিষ্য, জানা যায় না। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর ও ইহাঁরা সমসাময়িক। এই শিবানন্দ আচার্য্যই পদকর্ত্তা অনুমিত হইতেছেন। পদকল্পতরুর মধ্যে শিবাই ও শিবানন্দ ভণিতার যত পদ আছে, সমস্তই শিবানন্দ সেনের রচিত বলিয়া রায় মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুরের "নিজ নিজ মন্দিরে চলয়িতু পুনঃ পুনঃ দুহুঁ মুখচন্দ নেহারি" ইত্যাদি কল্পবল্লীতে উদ্ধৃত কলি দুইটী মাধব ঘোষের ভণিতাযুক্ত ৬৬০ সখ্যক পদে পদকল্পতরুর মধ্যে এইরূপ পাওয়া যায়,—

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুনঃ পুনঃ দুহুঁ দুহাঁ বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম-পয়োনিধি নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥"

ভরসা করি, ইহাঁকে কেহ শিবানন্দ সেন বলিয়া ভুল করিবেন না। প্রেমবিলাস বা ভক্তি-রত্নাকরে সেন মহাশয়ের নাম থাকিলে সেন পদবী থাকিত, কিংবা কর্ণপূরের সঙ্গে একত্র তাঁহার নাম উল্লিখিত হইত। খেতুরীর মহোৎসবের সময়ে সেন মহাশয় জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

নরোত্তম ঠাকুরের "রাইর দক্ষিণ কর" পদাংশ পদকল্পতরুর ১০৭৪ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে আরম্ভ এইরূপ,—

"কদম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি ॥"

উপসংহারে গোপালদাস সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমাদের মন্তব্যের সমাপ্তি করিতেছি। গোপালদাস সম্বন্ধে এই কথাটী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, শ্রীখণ্ডে সে কালে সংকীর্ত্তনের চর্চ্চা যথেষ্টই ছিল। গ্রন্থখানি যে উপলক্ষ্যে রচিত হইয়াছিল, এবং গোপালদাসের সময়ে শ্রীখণ্ডে যে সমস্ত পণ্ডিত ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবের বাস ছিল, সে সব কথাও আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। পুথিখানি যে শ্রীখণ্ড, জাজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছিল, এ অনুমানও করা যায়।

বীরভূম-বিবরণ, ৩য় খণ্ড লিখিবার কালে দেখাইয়াছিলাম যে, গোপালদাসের কয়েকটী মানের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। সে সময় রসকল্পবল্লী দেখি নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদের ধারা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, "থির বিজুরি বরণ গোরী" পদটী চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পদ-কল্পতরুর ভূমিকার ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় আমার সেই সমালোচনার উল্লেখে ইহাকে "অতিমাত্রায় কঠোরতা", "রুচির স্বেচ্ছাচার" ইত্যাদি বলিয়াছেন। এখন রসকল্পবল্লীর মধ্যে এই পদ গোপালদাসের ভণিতায় দেখিয়া তিনি কি বলিবেন জানি না। (এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, চণ্ডীদাস সম্পাদনের সুবিধার জন্য আমি এই ভূমিকার ফাইল দেখিবার অনুমতি রায় মহাশয় ও পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি)। ইহার পূর্ব্বেও একবার এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়ের অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী প্রকাশিত হইলে পর আমি সংক্ষেপে গ্রন্থখানির আলোচনা করি। "রাধে জয় রাজপুত্রী" পদটী রায় মহাশয় পদরত্নাবলীতে বদনের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমি ঐ পদ শশিশেখরের রচিত বলিয়াছিলাম, কিন্তু রায় মহাশয় স্বীকার করেন নাই (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪, ১ম ও ২য় সংখ্যা)। কিছুদিন পরে রায় মহাশয় শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বরচিত "নায়িকারত্নমালা" গ্রন্থ সম্পাদনকালে গ্রন্থমধ্যে পদটী শশিশেখরের ভণিতায় পাইয়া সন্তুষ্ট হন।

গোপালদাসের দুইটী পদ—"কালিয়দমন জগই তুয়া ঘোষই" (পদকল্পতরুতে ১০৫২ সং) ও "মঝু মনে দংশল মদন ভুজঙ্গ" (প-ক-ত, ১৬৭৬ সং)—গোবিন্দদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য লইয়া সম্পূর্ণ আলোচনা আজিও হয় নাই। এ আলোচনায়

আরও অধিক পুথি-পত্র আবিষ্কৃত ও বিচারিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের সকলের এখন সেই দিকেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। রসকল্পবল্লীর মত একখানি ছোট-খাট পুথি হইতেই যখন এত সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, ভাল ভাল পুথি পাওয়া গেলে, তখন না জানি, আরও কত কত বিষয়ের রহস্যোদ্ভেদ হইবে।

"থির বিজুরিবরণ গোরি" পদটী লিখিবার পূর্ব্বে গোপালদাস কতখানি ভূমিকা করিয়াছেন, দেখুন—

"অথ কৃষ্ণস্য প্রিয়ানঙ্গিক। কৃষ্ণ দেখিয়া রাই করে কত রঙ্গ। পরিধেয় বসন পরে অঙ্গ॥ ছাড়িয়া বান্ধয়ে কেশ উভ করি বাহু। রূপ দেখিয়া ফিরে চলে লহু লহু॥ সম্বরণ বক্ষ কভু করয়ে উদায। বেনি শ্লথ কভু নিতম্ব উদাস॥ সখি আলিঙ্গন করে ঘন আঁখি ঠারে। ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে পুলক অন্তরে॥ হারমালা আভরন দেখে নানা রঙ্গে। ভাবের আবেশে কভু আবেশ হয় অঙ্গে॥ চরন চলনভঙ্গি নানাবিধ গতি। গরবে দোলায় অঙ্গ মানস মুরতি। নাগরশেখর কৃষ্ণ স্থির নাহি হয়। সখা সখির মাঝে এই রস কয়॥"

গোপালদাস লিখিয়াছেন,—"অল্পকালে পিত্রি বিয়োগ না হইল অধ্যয়ন"। পুথির পয়ার পড়িয়া অনেকটা সেইরূপই মনে হইয়াছিল বটে। কিন্তু তাঁহার পদাবলী পাঠ করিয়া উহা বৈষ্ণবোচিত বিনয় বলিয়াই ধারণা হইতেছে। গোপালদাস যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, আশা করি, রসজ্ঞগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ হইবে না। এহেন কবির পদ আশানুরূপ সংগৃহীত না থাকায় এবং রসকল্পবল্লী বা রসমঞ্জরীধৃত পদকর্ত্তাগণের পদ না পাওয়ায় বৈষ্ণবদাসের অনবধানতাকে ইহার জন্য দায়ী করিব, না পদকল্পতরুর পরবর্ত্তী লিপিকরগণকে দোষ দিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। এক বলিতে হয়,—বৈষ্ণবদাস এ সব গ্রন্থ সন্ধান করেন নাই, শুধু শুনিয়াই পদ সংগ্রহ করিয়াছেন; নয় বলিতে হয়, পরে লিপিকরগণ অনেক পদের ভণিতার গোলমাল করিয়া দিয়াছে, ইত্যাদি। এ বিষয়ের বিচার-ভার পণ্ডিতগণের উপর রহিল।

উপসংহারে আর একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। পূর্ব্বকালের লোকে নিজে পদ রচনা করিয়া মহাজনের নামে চালাইয়া দিতেন, এইটাই অনেকের পক্ষে এক রকম স্বাভাবিক ছিল বলিলেও চলে। চুরি যে কেহ করিত না, এমন কথা বলি না। কিন্তু গোপালদাসের পক্ষে এ কথা বলা চলে যে, চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাসের পদ নিজের নামে চালানো সে কালে তাঁহার মত লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁহার গুরু, গুরু-ভ্রাতা, গুরু-পুত্র, শিক্ষা-গুরু প্রভৃতির তালিকা দেখিয়া বুঝা যায় যে, কিরূপ পণ্ডিত ও প্রভাবশালী বৈষ্ণব-সংঘের মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন এবং বাস করিতেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ঐ ঐ পদ আমরা গোপালদাসের রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি।*

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

* ১৩৩৭।২৮এ অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি*

বঙ্গভাষায় কৌলমার্গ বা তন্ত্রবিষয়ে কোনও পুথি একান্ত দুর্লভ। আমাদের দেশে প্রচলিত সাধন-ভজনেব বিশেষ বিশেষ প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি সহজিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত প্রণালীসমূহ লইয়া চর্চ্চা বা আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু তন্ত্রের সম্বন্ধে সে কথা বলা বড় খাটে না,—এ বিষয়ে পুথিব যথেষ্ট অভাব আছে এবং সে অভাব পূরণ করিতে পারিলে বাঙ্গালী-চবিত্রের ও সভ্যতার একটা ধারার সহিত পরিচয় ঘটিবে—একথা স্বীকার কবিতে পাবা যায়। তিন চার বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুরাতন পুথিব সঙ্গে অদ্যকাব আলোচ্য কৌলমার্গবিষয়ক পুথিটী আমার হস্তগত হয়। যদিও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাই নাই, মাত্র পাঁচ পাতা পাইয়াছি, তথাপিও মনে করি যে, ইহার সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে ততটুকুই বাহির কবিয়া দিলে ভাল হয়, নতুবা অনেকানেক অসমাপ্ত উদ্দেশ্যেব অনুরূপ, ইহাও কর্ম্মে পরিণত না হইয়া শুধু মনঃপীড়ারই কারণ হইবে। সুতরাং পুথিটীব যতটুকু পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

এই স্বল্পাকৃতি পুথিটী পড়িবাব পূর্ব্বে আবও দুই একটী কথা বলিতে চাই। মাত্র পাঁচ বৎসব পূর্ব্বে, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত অটলবিহাবী ঘোষ মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে কৌলমার্গ-সম্বন্ধীয় একখানি মাত্র প্রাচীন পুস্তক—(পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কৌলমার্গ-রহস্য, সংস্কৃত গ্রন্থেব সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা)—প্রকাশিত হইয়াছিল, পুস্তকটীর নাম 'সাধক-রঞ্জন'। তাহার পত্র-সংখ্যা ছিল ১-১৭,১৯-২১,২৩। এই পুস্তকটীর পত্র-সংখ্যা ১-৫। মনে হইতেছে যে, ইহা খণ্ডিত, কারণ, প্রথানুযায়ী আত্ম-পরিচয় নাই, তাহা নিশ্চয় উপসংহাব ভাগে রহিয়া গিয়াছে। তাহার সন্ধান আমরা আজ দিতে পারিলাম না। সাধক-রঞ্জনেব লিখন-রীতি ইহা হইতে ভিন্ন—সাধক-রঞ্জন উভয় পৃষ্ঠে লেখা; আর এটী এক পৃষ্ঠে। সাধক-রঞ্জনের প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ্‌ক্তি ধরিয়াছে, ইহার পৃষ্ঠা-প্রতি ৯-১০ পঙ্‌ক্তি দেখিতে পাইতেছি। সাধক-রঞ্জনে মোট প্রায় ৮০০ পঙ্‌ক্তি বা ৪০০ শ্লোক—ত্রিপদীকে তিনের স্থলে এক পঙ্‌ক্তি ধরিয়া; ইহাতে আছে প্রায় ২০০ পঙ্‌ক্তি। কিন্তু সাধক-রঞ্জনে কাব্যাংশ যথেষ্ট, ইহাতে তাহার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। সাধক কমলাকান্তের রচনায় আধ্যাত্মিক সত্যের বিবৃতি স্বল্প, ষট্‌চক্রভেদের ব্যাখ্যাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিপাদ্য, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমিলন কাব্যের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একমাত্র প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য, রূপক বা অলঙ্কারের ভারে তাহা ঢাকা পড়ে নাই, স্নিগ্ধ ও স্পষ্ট ভাষা সোজাসুজি মনের ভিতরে প্রবেশ করে।

উপসংহারভাগটী না পাওয়ায় গ্রন্থকারের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে

* ১৩৩৭।১৩ই পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভণিতার ব্রহ্মানন্দ নামটী ছদ্ম-নাম বা উপাধিমাত্র বলিয়া বোধ হয় ; সাধক-রঞ্জনেও ব্রহ্মনামের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। যোগমার্গে যিনি গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য, তিনিই ব্রহ্ম,—কথাটীর এইরূপ বিশেষ অর্থ অনুমান করিতেছি।

সাধক-রঞ্জনে আছে—"বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্মদরশনে।" (১ পৃঃ)

"একে একে ছয় চক্র ভেদ কৈল রামা।
নিশ্চয় জানিল এই ব্রহ্মের দুয়ার।
পুনর্ব্বার উঠিল ছাড়িয়া হুহুঙ্কার॥" (২৯ পৃঃ)

"ব্রহ্মনিরূপণম্" নামে এক স্বতন্ত্র প্রকরণ রহিয়াছে। (৩০-৩৩ পৃঃ)

পরিশেষে আত্মনিবেদনেও আছে—

"অতঃপর কহি শুন আত্ম নিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমঠ গোপালের স্থান॥" (৫১ পৃঃ)

ব্রহ্মকুল অর্থে ব্রাহ্মণকুল না বুঝাইয়া তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায় বুঝাইতেছে মনে করিতেছি।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥

নমস্কার গুরু পদে স্নান কৈলে ব্রহ্ম হ্রদে
পরম পবিত্র হয় মন॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈলে পরে গুরু কৃপা হয় তারে
নাহি হয় যমের দর্শন॥
মুক্তি হয় অনায়াসে নাহি পড়ে ভবপাশে
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয় সদা।
নিত্য সুখে মগ্ন থাকে আপনারে আপনি দেখে
গর্ভের যন্ত্রণা নহে কদা॥ ২॥
কৌলমার্গ মহাবিধি নিরূপিলা গুণনিধি
শক্তি সঙ্গে করিয়া বিচার।
গুহ্যাৎ গুহ্যতর কথা শুন শুন বীরমাতা
সাধকেরে করিতে নিস্তার॥ ৩॥
শিব আজ্ঞা সত্য বটে একথা আগমে রটে
ভাব বুঝি করহ নিশ্চয়।
বুঝিলে শিবের ভাব সর্ব্ব সিদ্ধি হয় লাভ
আনন্দেতে সদাকাল রয়॥৪॥
শিবোক্তি বিশ্বাস যারে কৃতান্ত কি করে তারে
সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা হবে মান্য।
শোক মোহ নাহি পাবে মহাজ্ঞানোদয় হবে
লোকেতে বলিবে ধন্য ধন্য॥৫॥

ভাব বুঝে কর্ম্ম করে শ্রেষ্ঠ বলি কয় তারে
ব্যত্তয় হইলে বলে ভ্রষ্ট।
কহিলেন ব্রহ্মানন্দ তত্ত্ব করো ভাল মন্দ
তন্ত্র মধ্যে লেখা আছে স্পষ্ট ॥৬॥

কৌলধর্ম্ম নিরূপণ করিলেন শিব।
আচরিলে অনায়াসে তরিবেক জীব ॥১॥
কারণের প্রতি যদি অনুরাগ হয়।
সমূহ আনন্দহ্রদে সদা মগ্ন রয় ॥২॥
ঐহিকে হইবে সিদ্ধ অন্তে মুক্তি পায়।
নিতান্ত শিবের উক্তি নাহিক সংশয় ॥৩॥
ব্রহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ।
আচরিলে কৌলধর্ম্ম যায় ভববন্ধ ॥৪॥

প্রমাণমাহ :—

সংত্যজ্য ভজনাচারং যো মে জ্ঞানং প্রপদ্যতে।
নিরস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যঃ কৌলাচারো বিধীয়তে ॥ ইত্যাদি রুদ্রজামল ॥

সত্ত্বরজতমোগুণে বাঁধা সর্ব্ব জনে জনে
বৃথা মনে করএ কল্পনা।
তিন গুণে লিপ্ত হৈয়া নিজরূপ বিসরিয়া
ভোগে দুঃখ সংসার যন্ত্রণা ॥
কর্ম্মপাশ কাটিবারে নিরন্তর কর্ম্ম করে
পঙ্কে পঙ্ক করয়ে ক্ষালন।
জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম না জানি তাহার মর্ম্ম
অন্ত কর্ম্মে করয়ে যতন ॥
না করিয়া বিবেচনা করে নানা কারখানা
অবশেষে নিন্দা করে লোকে।
জানিতে পরম তত্ত্ব ব্যয় করে নিজ অর্থ
প্রকাশ হৈলে জাতি ঠেকে ॥
কামনায় যে যে কর্ম্ম সকল মূঢ়ের ধর্ম্ম
হয় নয় মন্দ কর দৃষ্ট।
শ্রবণে কর্কশ হয় কেহ কেহ মন্দ কয়
পরিণামে হয় বড় মিষ্ট ॥

প্রমাণমাহ। ধর্ম্মবাণিজীকা মূঢ়া কনকামানরূধিমান্ ॥
ইতি মনুবচনাৎ ॥

পয়ার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গুণ প্রকৃতির।
হয় নয় শাস্ত্র মতে দেখ সর্ব্ব ধীর ॥ ১ ॥
গুণ প্রতি তিন গুণ বেদশাস্ত্রে কয়।
গুণেতে ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা নাহিক সংশয় ॥
সত্ত্বগুণে দিব্যভাব হয়ত উৎপত্তি।
স্বভাবে করয়ে কর্ম্ম নিজ নিজ বৃত্তি ॥
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসে হয় রত।
অন্তর্যাগে সদা থাকে চলে বিধিমত ॥
রজগুণে বীরভাব বহির্যাগে রত।
লোভের প্রভাব আর নীচ অনুগত ॥
অহং কর্ত্তা বলিয়া বিচারে করে স্থির।
ক্রিয়ায় প্রবর্ত্ত হয় বলে আমি বীর ॥
তমগুণে পশুভাব বিবিহীনে রত।
তামস জনের সঙ্গ জ্ঞান হয় হত ॥
সত্যাসত বিবেক না হয় কদাচিত।
অজ্ঞানে সদাই থাকে করে বিপরীত ॥
প্রকৃতির গুণে যতো হইতেছে কর্ম্ম।
কে করে করায় কেবা নাহি জানে মর্ম্ম ॥
ব্রহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ।
আচরিলে কৌলমার্গ যায় ভববন্ধ ॥
পঞ্চ মকারের বিধি কৈল নিরূপণ।
মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা অপরে মৈথন ॥
ইত্যাদি বিষয় ভোগে সাধন করিবে।
ঐহিকে হইবে সিদ্ধ অন্তে মুক্তি পাবে ॥

শ্লোক। আত্মতত্ত্বং ন জানাতি কথং সিদ্ধিঃ বরাননে ॥ ইতিশিবোক্তিঃ ॥
জ্ঞানান্মুক্তির্লভে সত্যং জাতিভেদাদিকং ন হি।
সর্ব্বজাতিষু নির্ব্বাণং জ্ঞানেন পরমেশ্বরি ॥ ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রে ॥

পদ পদার্থের অর্থ নিশ্চয় পরমতত্ত্ব
জ্ঞান হৈলে মুক্তিপদ পাবে।

১। অন্তর্যজন আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ছয় চক্র বিবরণ ॥
(সাধক-রঞ্জন, পৃঃ ২)

শোক মোহ নাহি হবে সর্ব্বদা আনন্দে রবে
নিজরূপবোধ হৈবে যবে ॥
না জানিলে নিজ তত্ত্ব তাহার সকল ব্যর্থ
অতএব নিরূপ জান।
সকল শাস্ত্রের মত ইহা বিনে অন্য পথ
নাহি কবে বিশেষে সুজন ॥

প্রমাণমাহ ॥ স্বস্বরূপমজানন্ বৈ জনোঽয় দৈববর্জিতঃ।
বিষয়েষু সুখং বেত্তি পশ্চাৎপাকে বিপন্নবৎ ॥ ইত্যাদি বাশিষ্ঠসারে ॥

সুযম সাধনে যদি পার হৈত ভবনদী
বিষম সাধন কেন কয়।
সংযম নিয়ম করি দিবানিশি ধ্যান ধরি
ঋষি মুনিগণ কেন রয় ॥
আহার করিয়া পত্র মুদিত হইয়া নেত্র
বহুকাল করেন সমাধি।
অনশন বহুকাল পরে ফল মূল জল
আহারের করিতেন বিধি ॥
সকল ছাড়িয়া শেষে গোফার ভিতরে বসে
বায়ু করে ভক্ষণ নির্ণয়।
পরে বায়ু রোধ করে মহানন্দ ধ্যান ধরে
সমাধি করিয়া তারে কয় ॥

পয়ার ॥ এসব কাষ্ঠার পরে জ্ঞানোদয় হবে।
জ্ঞানোদয় হৈলে পরে মুক্তিপদ পাবে ॥
বিশেষে লেখেন শমদম উপরতি।
তিতিক্ষু সমাধি শ্রদ্ধা সাধকের প্রতি ॥
এই মত সাধন করিতে চতুষ্টয়।
সাধন উত্তীর্ণ পরে জ্ঞানোদয় হয় ॥
জ্ঞানোদয় হৈলে পরে সদ্‌গুরু সেবিবে।
করিলে সদ্‌গুরু সেবা পরে মুক্তি পাবে ॥
যে যে কর্ম্ম ব্রাহ্মণের কৈল নিরূপণ।
তাহার মধ্যে কিছু নাহি নিদর্শন ॥
দ্বিবিধ কৌলের ধর্ম্ম করিল নির্ণয়।
নির্ণয় করেন ইহা ব্যাস মহাশয় ॥

শিব অভিপ্রায় জানি করিলা বিভাগ।
অন্তর্যাগ লিখিলো আর বহির্যাগ॥
অন্তর্যাগ বিধি লেখে ব্রাহ্মণের প্রতি।
শ্রেষ্ঠকর্ম্ম ব্রাহ্মণের অন্য নাহি গতি॥
বর্ণ্যনাং ব্রাহ্মণ গুরু বেদশাস্ত্রে কয়।
আছয়ে প্রবল শ্রুতি জান হয় নয়॥
বহির্যাগ বিধি লেখে ব্রাহ্মণ ইতরে।
হইবেক রতিমতি অন্তর্যাগ পরে॥
অন্তর্যাগ পরে জ্ঞান উদয় হইবে।
অনায়াসে অবশেষে কৈবল্য পাইবে॥
বদ্ধ মুক্ত সত্যজ্ঞানে করে নানা কর্ম্ম।
কো বা বদ্ধ কো বা মুক্ত নাহি জানে মর্ম্ম॥
বদ্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা ভাগবতে আছে।
আর আর অনেক শাস্ত্রে লেখে দুই মিছে॥
আগম নিগম দুই প্রবল প্রমাণ।
হয় নয় জান গিয়া যদি থাকে জ্ঞান॥
মিথ্যা জন্য কর্ম্ম করে করিয়া যতন।
অজ্ঞানে মোহিত হয় না জানে কারণ॥
বেদাগম সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশক ব্যাস।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া করিলে নির্যাস॥
অদেয়ো অপেয়ো করি লিখিলে অগ্রাহ্য।
এমত চাতুরি তবে লেখার কি কার্য্য॥
মৎস্য মাংস ব্যবহারে মুক্তি যদি হয়।
দুর্গম সাধনবিধি তবে কেন কয়॥
মুক্তির কারণ যদি হইতো মৈথন।
যত্ন করি করে কেন ইন্দ্রিয় দমন॥
এসব বিষয় ভোগে মুক্তি হৈত যদি।
মুক্তি ইচ্ছুক ঋষি করিতো নিরবধি॥

নখছেদে যাহা হয় অস্ত্র লয় কে কোথায়
বিচারিয়া করো অনুমান।
সুষম সাধনে কেন সমাধা না হয় মন
দুর্গম সাধনে করে জ্ঞান॥

পয়ার॥ অপরে লিখিলে যাহা করহ শ্রবণ।
অভিপ্রায় বিচারিলে হয় নিত্য জ্ঞান॥

নারিকেলোদক যদি কাংস্যপাত্রে রাখে।
সর্ব্বলোক শাস্ত্র মতে দুষ্ট করি লেখে॥
তাম্রপাত্রে পয়ঃ পান কেহ যদি করে।
ভ্রষ্ট বলি নিরন্তর নিন্দয়ে তাহারে॥
ঐ পাত্রে গুড় দ্রব্য স্পর্শ যদি হয়।
ভদ্রলোকে দুষ্ট বলি সর্ব্বক্ষণ কয়॥
যে যে পাত্রে অন্ন পাক হয় একবার।
সে সে পাত্রে অন্ন পাক নাহি করে আর॥
তাহাতে করিলে পাক অন্ন দুষ্ট হয়।
কি জন্যে নিষেধ করে করহ নির্ণয়॥
এমত নিষেধ লেখে অনেক প্রকার।
সকল লিখিলে পুথি হয়তো বিস্তার॥
স্তুতিশেষে ফলশ্রুতি করিলে নিশ্চয়।
অগম্যাগমন সুরাপান পাপ যায়॥
আঁচমনের জল যতো আছএ নির্ণয়।
তাহার অধিক হৈলে সুরাতুল্য হয়॥
সুরা তুল্য হৈলে পরে ক্রিয়া হয় পণ্ড।
ঐহিকেতে লোকনিন্দা পরে যমদণ্ড॥
তুল্য তার এই মত করিলা বিচার।
আসলের কতো গুণ কে ক(রে) নির্দ্ধার॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য শুন শিখীসেন পুনঃ পুনঃ
শাস্ত্রমধ্যে অনেক প্রকার।
শুনিলে এসব কথা দূর হয় ভবব্যথা
গর্ভবাস নহিবেক আর॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম চরমের এই ধর্ম্ম
সভে বলে করিয়া যতন।
মৃত্যু হয় গঙ্গাজলে লোকে ধন্য ধন্য বলে
সর্গে যায় চড়িয়া বিমান॥

পঞ্চম পাতকী যদি গৃহমধ্যে মরে।
শব কিম্বা অস্থি লৈয়া যায় গঙ্গাতীরে॥
সেই অস্থি গঙ্গাজলে করে সমর্পণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া স্বর্গে করেন গমন॥
যোজন মধ্যের পথে থাকে গঙ্গা গঙ্গা বলে ডাকে
হয় সেই শিবের সমান॥

সর্ব্বদা কৈলাসে বাস নাহি হয় কোন ত্রাস
বেদশাস্ত্র ইহার প্রমাণ ॥
গঙ্গা হৈতে জল যদি চণ্ডালে আনয়।
পাত্রান্তরে শুদ্ধ হয় শাস্ত্র মতে কয় ॥
গোহত্যাদি পাপ ধ্বংস হয় গঙ্গাজলে।
ত্রৈলোক্যতারিণী গঙ্গা বেদাগমে বলে ॥
গঙ্গার কণিকা জলে যাহারে অশুদ্ধ বলে
হয় সেই পরম পবিত্র।
এমত গঙ্গার জল কে বলে তাহার ফল
কেবা জানে সে সব চরিত্র ॥
অশুদ্ধ পবিত্র হয় জলস্পর্শ মাত্র।
আপনি অশুচি হন স্পর্শে সুরাপাত্র ॥
আশ্চর্য্য শাস্ত্রের গতি বুঝা কিছু ভার।
রচিলেন ব্রহ্মানন্দ করিয়া পয়ার ॥ ঃ ঃ ॥
কালাপাত উপাখ্যান শুন সবে দিয়া মন
সংক্ষেপে কহিব তার কথা।
যে জন্যে তাহার কষ্ট সংসারে বিদিত স্পষ্ট
বাহুল্য করণ ফল বৃথা ॥

পয়ার ॥ বিশেষে বৃত্তান্ত সবে আছ অবগতো।
বিস্তারিত করি লিখি জানাইব কতো ॥
অভিপ্রায় বুঝে দেখ ইহাতে যে হয়।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ইহা কভু নাহি হয় ॥
অপরে লেখেন যাহা করহ শ্রবণ।
বিচারিলে সবে তারে বলে বিচক্ষণ ॥
হস্তিপদাঘাত হৈতে প্রাণ যদি যায়।
শুণ্ডিকা আলয় গেলে প্রাণ রক্ষা হয় ॥
তথাপিহ নাহি যাবে আলয় তাহার।
শাস্ত্রমধ্যে নিষেধ লেখেন বারম্বার ॥
শাস্ত্রের নিষেধ মতে নাহি হয় ত্রাস।
আচার্য্য বলিয়া গিয়া করেন সম্ভাষ ॥
পুরোহিত সংজ্ঞা যার আচার্য্য আস্পদ।
কি মতে আচার্য্য হয় চুয়াইয়া মদ ॥
আচার্য্য হইতে যার হইল উৎপত্তি।
কারণ বলিয়া তারে করেন নিষ্পত্তি ॥

জনক যাহার তারে জন্য করি কয়।
আচার্য্য জনক বটে নাহিক সংশয়॥
জন্ম দিয়া আপনি জনক বলি ডাকে।
আনন্দের গুণ সেটা ক্ষণমাত্র থাকে॥
অকারণে কারণ করেন বিবেচনা।
এমত উন্মত্ত লোকে কে করিবে মান॥

ভাল মার্গ কহ যদি মন্দ বলে নিরবধি
পাষণ্ড বলিয়া তারে কয়।
কহিতে উচিত কথা মনেতে পাইয়া ব্যথা
লাঠি লৈয়া মারিবারে ধায়॥

প্রমাণমাহ॥ দিব্যৌষধিং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশ[ন]ং।
তদ্ব্যাধিবর্জ্জনং পথ্যং কুর্ব্বন্তি চ কুভোজনং॥ ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রে॥

লিখিয়া কৌলের বিধি করিল খণ্ডন।
নিষেধ করিলে যাহা শুন দিয়া মন॥
কলিতর বলি লেখে দুর্গোৎসবতত্ত্বে।
হয় নয় জান গিয়া ভবদেবে বর্ত্তে॥
নিষেধে মানেন বিধি বিধিতে নিষেধ।
চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া বলে নাহি ভেদ॥
লোকে নিন্দা করে যদি শুনে না সে সব।
কিছু জ্ঞান থাকে যার সে হয় নীরব॥

চক্রের বাহির হৈয়া দেহেতে চৈতন্য পাইয়া তখন বলেন ভেদ আছে।
এমত অভেদ করে খণ্ড জ্ঞান বলে তারে হয় নয় জ্ঞান গুরুর কাছে।
অজ্ঞানে অভেদ করে কারণের ধর্ম্ম।
ভেদাভেদ কিসে যায় নাহি জানে মর্ম্ম॥

জ্ঞান হৈলে ভেদ যায় অভেদ তাহারে কয় ভেদাভেদ তখনি সে যায়।
ভেদাভেদ গেলে শেষে মুক্তি হয় অনায়াসে পুণ্য পাপ কিছুই না রয়॥
বাহ্য কর্ম্মে ভেদাভেদ কখন না যায়।
আছএ শুকের লিপি দেখহ নিশ্চয়॥

প্রমাণমাহ॥ ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
ইত্যাদি শুকবচনাৎ॥

কর্ম্মপাশ কাটা যাবে তখন কৈবল্য হবে যতন করিয়া কাট পাশ।
শাস্ত্রে করো দৃঢ়মতি জ্ঞান সাধনের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানে কর কর্ম্ম নাশ।
ব্রহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ।
কৌলমার্গ আচরিলে যায় ভববন্ধ॥

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা

আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় লইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দক্ষ একজন। ইনি কাশ্যপগোত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার বংশে ১৬ জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং গ্রামীণ উপাধি লাভ করেন। গ্রামীণদিগকে বাঙ্গালায় গাঞি বা গাঁই বলে। ঘটকদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কাশ্যপগোত্রে ষোল গাঁই। এই ১৬ গাঁইয়ের মধ্যে চাটুতি গাঁইয়ের ছয় ঘর বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করেন। তাঁহারা আপনাদের চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কখনও দক্ষের দোহাই দেন না।

আমাদের চিরঞ্জীব শর্ম্মা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে. তিনি কুলীন নন—চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্যপগোত্রের আর যে পনরটী গাঁই আছে, তাহার কোনওটীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সেটী কোন্ গাঁই, তাহা আমরা জানি না। তবে চিরঞ্জীব শ্রোত্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক।

এই বংশে ইংরেজী ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাশীনাথ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাত দেখিয়া লোকের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিতেন—তিনি লোকের আকৃতি দেখিয়াও তাহার স্বভাব-চরিত্র এবং ভূত-ভবিষ্যৎও বলিতে পারিতেন। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম সামুদ্রক শাস্ত্র। । কাশীনাথের উপাধি ছিল—সামুদ্রকাচার্য্য।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের প্রতিভা খুব উজ্জ্বল ছিল। ইনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির উপর রঘুনাথ শিরোমণি যে দীধিতি নামে টীকা করেন. তিনি তাহার উপর প্রকাশিকা নামে টীকা লেখেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ভবানন্দী বাঙ্গালা দেশে বড় চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্রদেশে। মহাদেব পুস্তামকর নামে একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত, ভবানন্দীর উপর দুই টীকা লেখেন। একখানির নাম—সর্ব্বোপকারিণী। এখানি ছোট। আর একখানি বড় টীকা লেখেন, ইহার নাম ভবানন্দীপ্রকাশ। ভবানন্দী বাঙ্গালায় চলিল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবদ্বীপে। তিনি মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কুল ভাঙ্গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয়—অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে নলাহাটী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশের পৌত্র ও দৌহিত্রে নলাহাটী এককালে একটা বড় পণ্ডিতসমাজ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাঘবেন্দ্র নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও ছিল।

তাঁহার পাশে বসিয়া এক শত জন লোকে এক শতটী কবিতা পাঠ করিল। তিনি প্রত্যেকের কবিতা হইতে এক একটি কথা লইয়া নূতন এক শতটী কবিতা করিয়া দিলেন। এইটী তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। লোকে তাঁহাকে শতাবধান বলিত। সাধারণতঃ শতাবধান বলিতে যে এক শত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায়। পর পর এক শত লোক কথা বলিল—সেই কথা মনে করিয়া যে বলিতে পারে, তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র আর একরূপ শতাবধান। সমস্যাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি নানারূপ সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। তিনি দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন। একখানির নাম মন্ত্রদীপ, আর একখানির নাম রামপ্রকাশ। একখানি বৈদিকমন্ত্রের বই, আর একখানি স্মৃতির। মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুণ যে সকল বৈদিক কার্য্য তখনও চলিতেছিল—তাহাতে অনেক গোল ছিল। সেই গোল দূর করিবার জন্য তিনি মন্ত্রদীপ লেখেন। এখানি বোধ হয়, বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। রামপ্রকাশ ধর্ম্মকার্য্যের কালনির্ণয়ের বই।

দুই জন কবি তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী কবিতা লিখিয়াছেন। প্রথমটী এই,—

অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী।
সাক্ষাচ্ছতাবধানত্বমবতীর্ণা সরস্বতী॥

হরিহর নামে তাঁহার কোন ছাত্র বা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, সরস্বতী হইতেই আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সেই সরস্বতীও সাক্ষাৎ শতাবধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আর একজন কবি বলিয়াছেন,—

পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণা সরস্বতী।
জিতঃ শতাবধানোঽতো বিষ্ণুনাপি ন জিষ্ণুনা॥

সরস্বতী পুরুষের রূপ ভালবাসেন বলিয়া পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই জন্য বিষ্ণুও শতাবধানকে জয় করিতে পারেন নাই।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ছাত্র হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকার্দ্ধ বলিয়াছিলেন,—

অয়ং কোঽপি দেবোঽনবদ্যাতিবিদ্য-
শ্চমৎকারধারামপারাং বিভর্ত্তি॥

এ ছাত্রটী কোনও দেবতা হইবেন। ইঁহার পড়াশুনা করিবার ধারা নূতন রকম ও চমৎকার।

রাঘবেন্দ্রের একটী পুত্র হইয়াছিল। পিতা রাশি দেখিয়া নাম রাখিলেন—বামদেব। তাঁহার জেঠা মহাশয় তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেন—তুমি চিরঞ্জীব। তিনি জেঠার দেওয়া নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বালককালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার বলে অপঠিত শাস্ত্রেরও তিনি অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়া গিয়াছেন,—দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। তিনি যশোবন্ত সিংহ নামক রাঢ় দেশের একজন জমিদারের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব-

দেওয়ান হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাই বাঙ্গালার স্বাধীনপ্রায় রাজা—নামে মাত্র দিল্লীর সুবেদার। ঢাকায়ও তখন একজন ফৌজদার থাকিতেন। যশোবন্ত তাঁহারই কাছে নায়েব ছিলেন। ১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তখন ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী। শায়েস্তা খাঁর সময় বাঙ্গালায় আট মণ করিয়া চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। এটা একটা মস্ত কথা। শায়েস্তা খাঁ এই ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকায় একটা গেট নির্ম্মাণ করেন ও তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া দিয়া যান—আর যাহার রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাউল হইবে, সেই এই গেট খুলিতে পারিবে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তের নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয়। তাই তিনি মহা সমারোহে শায়েস্তা খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন। এখনও ঢাকার কেল্লায় লোকে সেই গেট দেখাইয়া দেয়।

চিরঞ্জীব এই যশোবন্ত সিংহের বাড়ীর পণ্ডিত ছিলেন বা তাঁহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে অলঙ্কারের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম কাব্যবিলাস। কাব্যবিলাসে তিনি সিংহভূপতির নাম করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তরত্নাবলীতে তিনি যশোবন্ত সিংহের প্রচুর স্তুতিগান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম। তিনি ৭২ শ্লোকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

কোদণ্ডধ্বনিখণ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্বাতিগর্ব্ব প্রভো
গৌড় **শ্রীযশবন্ত সিংহ** নিতরামাকর্ণয়াকর্ণয়।
যত্র স্যুর্মসজা গণাস্ততগণৌ তাখ্যো গণোঽন্তেগুরু-
বিশ্রামো রবিভির্ণগৈস্তদুদিতং শার্দূলবিক্রীড়িতম্॥

তিনি তাঁহার কাব্যবিলাসে জয়সিংহ নামক এক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই,—

উপেত্য ত্রেতাতো নিজচরণহানিক্রমমতঃ
সমন্তাদ্ধর্ম্মোঽভূদ্‌বলবতি কলাবেকচরণঃ।
পুরস্তাদদ্যৈবং জয়িনি জয়সিংহক্ষিতিপতৌ
বভূবুশ্চত্বারঃ পুনরভিনবাস্তস্য চরণাঃ॥

এই জয়সিংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজা। ইঁহার নাম ছিল—সেওয়াই জয়সিংহ। জয়পুরে ইঁহার রাজত্ব ছিল। এখনকার আলোয়ার তখন তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। সেখাবাটীও তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। তাহার উপর তিনি বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন এবং প্রায়ই দিল্লীতে থাকিতেন। কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুবার সুবেদারীও করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিতেছেন,—তিনি জয়লাভ করিলে ধর্ম্ম যে যুগে যুগে এক একটী পা হারাইয়াছিলেন, সেই সব কয়টী পা তিনি নূতন করিয়া পাইয়াছিলেন। যে জয়সিংহ সম্বন্ধে চিরঞ্জীব এত বড় কথা বলিলেন, তিনি বাঙ্গালার সাধারণ জমিদার হইতে পারেন না। তিনি এই বড় জয়সিংহই হইবেন। জয়সিংহের নাম সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইনি ১৭১৪ সালে দক্ষিণ হইতে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া জয়পুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালী এক বৈদিক ব্রাহ্মণ জয়পুরনগর পত্তন করেন। ইঁহার নাম বিদ্যাধর। ইহার পূর্ব্বে আমের জয়পুরের রাজধানী ছিল। আমের দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা গলি। রাজ্য বড় হইলে সেখানে আর রাজধানী রাখা চলে না বলিয়া সেখান হইতে ৭ মাইল দূরে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহা এক কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমির উপর নির্ম্মিত—চারি দিকেই জল চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। এই নগর নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, জয়সিংহের অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা হয়। অশ্বমেধ করিতে হইলে অশ্বকে ত যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিতে হয়। জয়সিংহ ত তাহা পারেন না। তাই তিনি অশ্বকে নিজের মণ্ডলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—দিল্লীর এলাকায়ও যাইতে দেন নাই—যোধপুরের এলাকায়ও যাইতে দেন নাই।

জয়পুরের রাজা মানসিংহ সম্বন্ধেও চিরঞ্জীব অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মানসিংহ আকবরের সময় দিল্লীর প্রধান ওমরাহ ছিলেন। জাহাঙ্গীরের ত তিনি মামাই ছিলেন। তিনি দুইবার বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। শেষবার প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়া যান। বাঙ্গালায়—বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে—তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি অনেককে অনেক ভূমি ইত্যাদি দান করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতরাও তাঁহার অনেক গুণগান করিয়াছেন, তাঁহার নামে নিজেদের বই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। চিরঞ্জীব তাঁহার সম্বন্ধে এই কবিতাটী লিখিয়াছেন,—

অদ্যৈবায়ং প্রলয়জলধিস্ত্যক্তবেলোঽপ্যবেলম্
অদ্যাপ্যেষ ভ্রমতি পরিতো ভূপতির্মানসিংহঃ।
ইত্থং কীর্ত্তিক্ষিতিপ! ভবতো জৈত্রযাত্রান্তরালে
ভূয়োভূয়ঃ প্রসরতি সতাং ত্যক্তবাদঃ প্রবাদঃ॥

মানসিংহ প্রায় এক শত বৎসরের পূর্ব্বেকার লোক হইলেও তখনও তাঁহার কথা লোকের নিকট প্রত্যক্ষের মত ছিল।

চিরঞ্জীব তাঁহার কাব্যবিলাসে বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের কথা বলিয়াছেন। এই বিজয়সিংহ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না; তিনি বলিয়াছেন, মৃগমদ পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইরূপ বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার যশ ভুবনবিস্তৃত ছিল।

চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার যা কিছু লেখাপড়া, তাহা পিতার নিকট হইতেই শেখা। তিনি পিতাকে শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহা হইতে বড় অন্য দেবতা কেহ আছেন বলিয়া জানিতেন না। মাধবচম্পূ নামে তাঁহার যে কাব্য আছে, তাহার প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভঙ্গ শ্লোকে তিনি তাঁহার পিতার গুণগান করিয়াছেন। তিনি বড় বাপের ছেলে বলিয়া গুমর করিতেন—নিজের কার্য্যকে ছোট বলিয়া প্রচার করিতেন। আমরা সর্গ-ভঙ্গের একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম,—

দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রোদ্বুদ্ধবুদ্ধিশ্রুতো
ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।
বাল্যে কৌতুকিনা তদাত্মজচিরঞ্জীবেন যা নির্ম্মিতা
চম্পূর্মাধববর্ণিকেহ সমভূদুচ্ছ্বাসকঃ পঞ্চমঃ॥

এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়, তিনি এই গ্রন্থখানি তাঁহার পিতার জীবিতকালেই লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা কৌতুকবশতঃ বা বাল্যকালের চাপল্যবশতঃ লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পিতা যখন কাশীবাস করেন, তখন তিনি সঙ্গে ছিলেন। পিতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি অতি বিনয়সহকারে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

বাগ্‌দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনৈরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।
বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষা কৃতি-
র্বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈঃ॥

ইনি ইহাতে যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালায় যত পণ্ডিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক বিদ্যাসাগরের নাম সুবিখ্যাত, তিনি কলাপ ও ভট্টির টীকাকার। কিন্তু তাঁহার কাল নির্ণীত হয় নাই।

ইনি কাব্যবিলাসে গুরুবিষয়া রতির উদাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্য্যের নাম করিয়াছেন। বোধ হয়, ইনি ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে রঘুদেবের নিকট যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের আর অন্য গুরুর উপাসন করিবার কোনও দরকার হইত না। ইনি লিখিয়াছেন,—

ইমৌ ভট্টাচার্য্যপ্রবররঘুদেবস্য চরণৌ
শরণ্যৌ চিত্তান্তর্নিরবধি বিধায় স্থিতবতঃ।
কিমন্যৈর্বাগ্‌দেবীপ্রমুখভজাং প্রভজনৈঃ
পরিস্ফূর্ত্ত্যৈ বাচামমৃতলহরীনির্ঝরজুষম্॥

রঘুদেব, জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক লোক। ইনি জগদীশের ছাত্র ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার লেখা অনেকগুলি বই আছে।

চিরঞ্জীব শর্ম্মার একখানা কাব্যের নাম মাধবচম্পূ। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। এই চম্পূর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রাজধানী মধুপুর। তিনি একবার মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ায় যে সকল পশু লক্ষিত হয়, কবি সে সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের আকার, প্রকার, গতি প্রভৃতির বেশ বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয়, কখনও মৃগয়া দেখেন নাই—কখনও শিকার খেলিতে যান নাই। তাঁহার গ্রন্থে শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্তু তবু তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'নহি কিঞ্চিদবিষয়ো ধীমতাম্।' এই মৃগয়াব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের এক সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম কুবলয়াক্ষ। এ নাম আমরা

পুরাণাদিতে পাই না। মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের বর্ণনাই বেশী। হাতীতে হাতীতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে শূকরে লড়াই, বানরের উকুন খাওয়া—এই সকলই দেখিতে পাই।

অনেকক্ষণ মৃগয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা পাইল, তিনি এক হ্রদের ধারে বসিলেন। সেখানে কলাবতী নামে একটী মেয়ে স্নান করিতে আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিলেন—কলাবতীও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পৌঁছিলে কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল—'উড়িষ্যার রাজার কন্যা কলাবতীব স্বয়ংবর। সেখানে অনেক দেশের রাজা আসিবেন, আপনিও চলুন।'

স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন বাঙ্গালদেশের রাজা, গৌড়দেশের রাজা, মিথিলার রাজা, কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণদেশের রাজা, কাশ্মীরেব রাজা ও মধুপুরের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংবরের যাহা ফল, তাহা ত জানাই আছে। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহাব যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল কলাবতীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় যাইতে বলিলেন। তিনি দ্বারকায় গেলে কলাবতী বিরহে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পবে তিনি এক হংসকে দূত করিয়া দ্বারকায় পাঠাইলেন। হংস কলাবতীর বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন—'ভাবতখণ্ডে বড় রাক্ষসের উপদ্রব। আমি তাহা নিবারণ করিতে চলিলাম।' এই বলিয়া তিনি মধুপুরে কলাবতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আব একখানি বই বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে। প্রথমটীতে কবির নিজের এবং বংশের পরিচয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আরম্ভ। এক প্রভুর বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতেব নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্রথম আসিলেন বৈষ্ণব—নাক হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্মের ছাপ; হল্‌দে ছোপানো কাপড়; গলায় তুলসীর মালা; মুখে হরিনাম। তিনি আসিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন।' তাহার পর শৈব আসিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্বাঙ্গে বিভূতি আর আধখানা শরীর রুদ্রাক্ষে ঢাকা। তার পর শাক্ত আসিলেন—মাথায় জবাপুষ্প, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা। তাহার পর আসিলেন হরিহরাদ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িক—নৈয়ায়িকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক। তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতঞ্জল পণ্ডিত, পৌরাণিক, জ্যোতির্ব্বিদ্, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট পতঙ্গ মারা যায়, এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক

মুণ্ডিত—চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন,—বঞ্চকেরা তোমাদের শিখাইয়াছে—দেবতাদের অর্চনা কর, প্রতিদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য কর, মহাযজ্ঞের জন্য হিংসা কর। এই সকল কথা তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের এই বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধি কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা হইতে আসিল? সে বলিল,—আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, আর তোমরা ভারী পুণ্যশীল—কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন,—যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়,—যজমানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যায্য বল। নাস্তিক বলিল,—কি ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায়? মীমাংসক বলিলেন,—এ কি, বেদ-পুরাণশাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিষের প্রশংসা আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ?

নাস্তিক—বেদ ত বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কি? পুরাণেরই বা প্রামাণ্য কি? তাহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

মীমাংসক—কর্ম্ম যদি না থাকে, কি কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

নাস্তিক—কর্ম্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম্ম অর্জন করিয়াছে? যদি বল, জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম, তবে তাহার প্রমাণ কি? সুখ-দুঃখাদি ত প্রবাহধর্ম্ম। মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার ঠিকানা নাই। বস্তুতঃ জগৎটাই অসৎ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভ্রম।

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদান্তী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক। কেবল সত্য এক ব্রহ্ম আছেন। তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন,—বেশ, বেশ, তুমি ত আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা ব্রহ্ম কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ?

বেদান্তী—তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বগামী, তেজঃস্বরূপ, তিনি পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর।

নাস্তিক—তবে আর মিথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশূন্য একটা ব্রহ্ম লইয়া কি করিবে?

এই কথা বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নৈয়ায়িক গর্ব্বভরে বলিলেন,—তুমি আপনার মতটা আগে পরিষ্কার করিয়া বল, তার পর অন্য কথা কহিও। যে কাণা, সে যদি বলে—তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে কেবল হাসিবে। নাস্তিক ভাবিলেন,—আমরা যুক্তিধারা বর্ষণ করি। এ দেখিতেছি, ঝড় হইয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে আসিতেছে। কিছু ভাবিয়া বলিল,—আমাদের মত শোন—মাধ্যমিকদিগের শূন্যবাদ, যোগাচারদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদিগের জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, বৈভাষিকদিগের ক্ষণিক বাহ্যার্থবাদ, চার্ব্বাকদিগের দেহাত্মবাদ এবং দিগম্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দেহ-পরিমাণবাদ, আমাদের এই ছয়টী প্রস্থান। আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত—স্বর্গ নাই, নরক নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, এ জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, ভর্ত্তা কেহ নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ

নাই। দেহ ভিন্ন কর্ম্মফলভোগী কেহ নাই। সমস্তই মিথ্যা। এগুলিকে যে সত্য বলিয়া মনে হয়, সে কেবল মোহ। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপ্রপীড়ন মহা পাপ, অপরাধীনতাই মুক্তি, অভিলষিত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ।

তার্কিক উপহাস করিয়া বলিলেন,—যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক; কেন না, বিদেশগত আর মৃত, এই দুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য।

নাস্তিক বলিলেন,—মৃতের পুনর্বার দর্শন হয় না। কিন্তু যে বিদেশে গিয়াছে, তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে সম্ভাবনা আছে? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে, কেন শোক না হইবে?

নাস্তিক—পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার জন্য শোক করিবে?

তার্কিক—তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে ত? তবে অনুমানও ত প্রমাণ দাঁড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, যদি আপ্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কি?

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—মানিলাম, শব্দ ও অনুমান প্রমাণ হইল। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি করিয়া?

নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই ত তিনি হারিয়া গেলেন। তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহাকে দিয়া আরও কথা কহাইয়াছেন।

এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একটা নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল কথায় সে হারিয়া গেল। তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন—তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহাদের বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে পর শৈব বলিলেন,—যোগীকে মুক্তি দিবার কর্ত্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন,—না, বিষ্ণু। তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন,—রাম। তখন তিন জনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মাঝে আর একজন আসিয়া বলিলেন,—না, না, মুক্তি ত রাধা দিবেন। এইরূপে চার পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন,—হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ এবং উপসংহারে বলিলেন,—

যে চাত্মনো নূনমভিন্নতায়াং
শরীরভেদাদপি ভেদমাহুঃ।
তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ
দেহার্দ্ধধারী হরিরপ্যকারি॥

এই বইএ চিরঞ্জীব শর্ম্মা লোকায়ত, দিগম্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়তদের জৈনদের মত পথ ঝাঁট দিতে দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ কখনও করিত না। তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক। কেন না, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। লোকায়তেরা পরলোক মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরলোক মানে। তাহাদিগকে লোকায়তদের সহিত এক করা ভাল হয় নাই। যদি বল, উহারা সকলেই নিরীশ্বর; সেই জন্য নাস্তিক বলিব,—তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন—যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই নাস্তিক।

দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা দর্শন শাস্ত্রের চটি বইএর অপেক্ষা অনেক বেশী। চটি বইএ এক এক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি মাত্র পাওয়া যায়—অন্য দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুইই দিয়াছেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারে ও একটু রসাল ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থখানির একটী বাঙ্গালা তর্জমা করিয়াছিলেন, তর্জমা এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরও রসাল ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন—পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শন শাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ব্রজবুলি

[১]

ব্রজবুলি বাঙ্গালার একটী উপভাষা। উপভাষা হইলেও ইহা কখনই কথ্যভাষা ছিল না। ব্রজবুলি মূলতঃ মৈথিলভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহা বঙ্গদেশে, বাঙ্গালী কবির হস্তে এবং বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয়ে ও রসসঞ্চারে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বাঙ্গালার উপভাষা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে মৈথিলভাষার অন্তর্ভুক্ত করিতে এবং কবিরাজ-গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদকে মৈথিল সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ গণ্য করিতে চাহেন। এই চেষ্টা ভ্রান্তিমূলক, এবং অত্যন্ত আপত্তিজনক। ব্রজবুলি সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যেরই একদেশ।

পূর্ব্বভারতে মুসলমান শাসনের প্রথম অবস্থায় মিথিলা ও তীরভুক্তি প্রদেশ বহুদিন যাবৎ হিন্দু রাজার অধীনে স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সেই কারণে মগধ ও বঙ্গদেশে যখন হিন্দুজাতির ও ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার অতীব দুর্দ্দিন যাইতেছিল, তখনও হিন্দু রাজার শাসনে মিথিলায় ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছিল। পরে যখন দুর্দ্দিন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে এবং শান্তিপুর ও নবদ্বীপ প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাস্থলীতে সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা অবাধে হইতেছে, তখনও বাঙ্গালা দেশ হইতে অধীতবিদ্য ছাত্র তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য, অথবা নব্যন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য, মিথিলায় যাইত, এবং তথা হইতে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বিদ্যাপতি প্রভৃতি মৈথিল কবির গান কণ্ঠস্থ করিয়া আসিত। এই গানগুলি তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। স্বল্পকাল পরেই বাঙ্গালী কবি ভাঙ্গা-মৈথিল ভাষাতে এই গানগুলির অনুকরণে গান বা কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভাঙ্গা-মৈথিলই ব্রজবুলির আদিম রূপ। এই ব্যাপার—অর্থাৎ ব্রজবুলির সৃষ্টি—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু কাল পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ যতদূর জানা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের অনুচরই এই উপভাষার প্রথম কবিদিগের অন্যতম। আসাম এবং উড়িষ্যাতেও এই সময়ে এইরূপ ব্রজবুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাপ্রভু যাহা শুনিয়া প্রেমে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সেই বিখ্যাত পদ "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" ইহার প্রমাণ।

এই ভাষায় 'ব্রজবুলি' নামকরণ পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্যদিগের হস্তে এই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং বিস্তার হয়। সেই হেতু এই সাহিত্যের বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ—মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রধান অনুচরদিগের স্তুতি ও বন্দনা—এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। শেষোক্ত বিষয়টী এই সাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্তু

হওয়াতে এই ভাষার 'ব্রজবুলি' আখ্যা প্রচলিত হইল। ব্রজবুলির সহিত মথুরা অঞ্চলের আধুনিক কথ্যভাষা 'ব্রজভাষা'র কোন সম্বন্ধ নাই। তবে নানা কারণে ব্রজবুলির মধ্যে কিছু কিছু হিন্দী শব্দ ও রূপ প্রবেশ করিয়াছে।

যে সময়ে ব্রজবুলি ভাষার উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়, সে সময়ের মৈথিল ও বাঙ্গালাভাষার মধ্যে পার্থক্য এখনকার অপেক্ষা খুবই কম ছিল। সুতরাং মৈথিলভাষা তখনকার বাঙ্গালীর নিকট যথেষ্ট সুবোধ্য ছিল। অথচ মৈথিল ভাষায় তখনও বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ-কার লোপ পায় নাই। এই জন্য শ্রুতিমধুর মাত্রা-বৃত্ত কবিতা রচনা—যাহা তাৎকালিক বাঙ্গালায় সম্ভবপর ছিল না—তাহা এই ভাঙ্গা-মৈথিল ব্রজবুলিতে সম্ভবপর হইয়াছিল। এই শ্রুতি-মাধুর্য্য ও সংস্কৃতরীতি-অনুগামিতার জন্যই এই কৃত্রিম ভাষায় লিখিত সাহিত্য তখনকার দিনে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত এবং বৈষ্ণব ভক্ত-সমাজে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। কৃত্রিম ভাষায় যে উচ্চদরের সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব, এবং কৃত্রিম ভাষায়ও যে মানবমনের চরম আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি অসম্ভব নয়, তাহা এই ব্রজবুলি হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে।

[২]

ব্রজবুলিতে সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের প্রাচুর্য্য অত্যধিক। শক্তিহীন কবিদিগের হস্তে এই তৎসম শব্দ-বাহুল্য স্থানে স্থানে ভাবপ্রকাশের বিলক্ষণ বাধা জন্মাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দের সুরকে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার মধ্যে দুটী একটী কথার অর্থ সাধারণ লোকের না জানা থাকিলেও তাহাতে আসিয়া যায় না, কারণ ছন্দের নৃত্যচপলতা এবং ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য্য তাহার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে কাড়িয়া লইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কবিরাজ গোবিন্দদাসের এই কবিতাটী উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল গোপ গোকুল-কুলজ-কামিনি-কন্ত।
কুসুম-রঞ্জন-মঞ্জু-বঞ্জুল-কুঞ্জমন্দির সন্ত॥
গণ্ড-মণ্ডল-বলিত-কুণ্ডল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব-তাল-পণ্ডিত বাহু-দণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কোমল-চরণ-কিশলয়-নিলয় গোবিন্দদাস॥

সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের পরেই প্রাকৃত (অর্দ্ধতৎসম) শব্দের বাহুল্য। অবশ্য এইরূপ অর্দ্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগ তৎকালের বাঙ্গালা ভাষায়ও কিছু কম ছিল না। তবে ব্রজবুলির অর্দ্ধতৎসম শব্দের মধ্যে অনেকটা অংশ যে ছন্দানুরোধে তৎসম শব্দের বিকৃতি ঘটিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাব ব্রজবুলির উপর যথেষ্ট পড়িয়াছিল। এক হিসাবে ধরিতে গেলে এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য্য (সংস্কৃত-প্রাকৃত) সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বাঙ্গালায় অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে।

ব্রজবুলিতে বৈদেশিক শব্দের মধ্যে কেবল এই ফারসী শব্দগুলি প্রচলিত আছে। আর তাহার প্রয়োগও শুধু অর্ব্বাচীন সময়ের কবিতাতেই বেশী দেখা যায়। বিদ্যাপতির লেখাতেও আরও দুই একটী ফারসী শব্দ পাওয়া যায়।—

কবজ, খত, কলম, দোত (দোয়াত), কাগজ, দোকান, দালাল, কিতাব, ওয়াজ (আওয়াজ), মুহর (মোহর), মহল, বাজার, মাফ, নফর, কামান (= ধনু), কুলুপ, সরম, কম, নালিশ, বালিশ, জীদ (জিদ), আতর, গুলাব। 'মুহর' শব্দটীর নামধাতুরূপে প্রয়োগ আছে।

[৩]

ব্রজবুলিতে অ-কারের তিন রকম উচ্চারণ ছিল,—(১) সংবৃত, যেমন 'অন্ধ' শব্দের আদিস্থিত 'অ', অথবা ইংরাজী 'hot' শব্দের 'o' ; (২) বিবৃত (খুব হ্রস্ব আ-কারের মত) যেমন ইংরাজী 'but' শব্দের 'u' ; (৩) অতি সংক্ষিপ্ত (অর্দ্ধমাত্রা) স্বর, যেমন ইংরাজী 'about' শব্দের 'a' ; এই তিন রকম উচ্চারণের মধ্যে প্রথম দুইটী-ই সুপ্রচলিত, এবং ইহার মধ্যে পরস্পরের অদল-বদল সকল ক্ষেত্রেই হইতে পারিত। তবে দ্বিতীয় উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে না থাকার দরুণ প্রথম উচ্চারণটীরই পরে প্রাধান্য দাঁড়াইয়া যায়। তৃতীয় উচ্চারণ খুব বিশেষ স্থলে ভিন্ন পাওয়া যায় না, যেমন,—

"ভাগবত-শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতিধন" ;
"অমল-কমল-চরণ-কিশলয়-নিলয়-গোবিন্দদাস"।

আ-কারেরও তিন রকম উচ্চারণ ছিল,—(১) দীর্ঘ, (২) হ্রস্ব, এবং (৩) বিবৃত অ-কারের মত। আ-কারের তৃতীয় প্রকার উচ্চারণ হইলে অনেক ক্ষেত্রে লিপিতে অ-কার লেখা হইত। যথা,—

"বনি বনমাল **আ**জানু (পাঠান্তর 'অজানু') বিলম্বিত" ;
"কাঞ্চন বসন রতনময় **আ**ভরণ (পাঠান্তর 'অভরণ)"।

ই-কার এবং ঈ-কারের দুই রকম উচ্চারণ ছিল,—(১) হ্রস্ব, এবং (২) দীর্ঘ। হ্রস্ব ই-কার (ঈ-কার)-এর উদাহরণ,—

"কালি-দমন দিন মাহ" ;
"উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব"।

দীর্ঘ ঈ-কার (ই-কারের)-এর উদাহরণ,—

"দেই রতন পুন লেয়লি চোরি।"
"উন্নত-গীম সীম নাহি অনুভব"।

উ-(উ-) কারেরও সেইরূপ দুইটী উচ্চারণ,—(১) হ্রস্ব, যথা,—

'প্রেমমুকুটমণি-ভূষণ-ভাবাবলি" ;
"সনাতন-রূপ-কৃত গ্রন্থ ভাগবত" ;

(২) দীর্ঘ, যথা,—

"প্রেমপ্রবর্দ্ধন-নবঘনরূপ" ;

"অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল"।

এ-কারেরও দুই প্রকার উচ্চারণ—(১) হ্রস্ব, যথা,—

"যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল" ;

(২) দীর্ঘ, যথা,—

"বিপুল-পুলক-কুল-আকুল-কলেবর"।

ও-কারেরও দুই রকম উচ্চারণ—(১) হ্রস্ব, যথা,—

"আপন করম-দোষে ভেল বঞ্চিত" ;

"মদন-হিলোলে তো বিনু দোলত" ;

(২) দীর্ঘ, যথা,—

"সুর-মুনি-গণ-মন-মোহন-ধাম।"

অ কার এবং ও-কার আবার অনেক সময় অন্তঃস্থ ব-কারের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"রতন-মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরী
সখি-সঞে রস-পরথাঅ (পাঠান্তর-'পরথায়')।"

"দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম।"

ব্রজবুলির ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায় বাঙ্গালারই মত। বিশেষত্ব কেবল এইগুলিতে।—য কারের সাধারণ উচ্চারণ ছিল "য," কিন্তু ইহার উষ্ম উচ্চারণও (বিশেষতঃ অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে) দেখা যায়। ছ-কারের উচ্চারণ কতক স্থলে স-কারের মত ছিল বলিয়া বোধ হয়। শ-কার ও স-কারের উচ্চারণ ব্রজবুলিতে একাকার হইয়া যায় নাই। অন্তঃস্থ ব-কার একেবারে লুপ্ত হয় নাই ; একটী মহাপ্রাণ অনুনাসিক (হ্ব, = ন্হ)ও বর্ত্তমান ছিল।

[৪]

ব্রজবুলির তদ্ভব ও অর্দ্ধতৎসম শব্দগুলির মধ্যে অনেক স্থলে স্বরবর্ণের ব্যত্যয় দেখা যায়। এই স্বর-ব্যত্যয় স্থূলতঃ এই প্রকারের,—

আ-কার স্থলে অ-কার :—

(১) আদ্য। যথা,—অথাড় (আষাঢ়), অবেশিত (আবেশিত), অগোরল (আগোরল), অরাধল (আরাধল)।

(২) মধ্য। যথা,—কন্ত (কান্ত), পষাণ (পাষাণ), কহিনী (কাহিনী), সমধান (সমাধান), মধাই (মাধাই), চঁদনি (চাঁদনি), লগে (লাগে), বতাস (বাতাস)।

(৩) অন্ত্য। যথা,—বালিক (বালিকা), বাধ (বাধা), মাত (মাতা), লোচনতার (-তারা), গঙ্গ (গঙ্গা), পাদুক (পাদুকা), শলাক (শলাকা), সেব (সেবা), কামন (কামনা)।

অ-কার আ-কারের বিপর্য্যয়—

যথা,—যামুন (যমুনা), মাথুর (মথুরা), উপাম (উপমা), গাঙ্গ (গঙ্গা)।

অ-কার স্থলে আ-কার—

যথা,—বন্ধান (বন্ধন), নয়ান (নয়ন), বয়ান (বয়ন < বদন), শয়ান (শয়ন), সুজান (সুজন), চাতুর (চতুর)।

ই-কার স্থলে অ-কার—

যথা,—রুচ (রুচি), রীত (রীতি), প্রীত (প্রীতি), ছব (ছবি)। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার নিয়মানুগত।

য-ফলার স্থলে ই-কার—

যথা,—লাবণি (লাবণ্য), ভাগি (ভাগ্য), ধনি (ধন্য), সাখি (সাক্ষ্য), নিতি (নিত্য), সাফলি (সাফল্য), সতি (সত্য), শেলি (<*শেল্য <শেল+শল্য), মধি (মধ্য), বাকি (বাক্য), মৌগধি (মৌগ্ধ্য)।

বিপ্রকর্ষ—

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায়ই বিপ্রকৃষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হয়, এবং 'অ', 'ই' এবং 'উ' বিপ্রকর্ষ স্বররূপে ব্যবহৃত হয়।

'অ'—সনেহ (স্নেহ), পরাত (প্রাতঃ), করম (কর্ম্ম), ভরম (ভ্রম), তীখন (তীক্ষ্ণ), ভসম (ভস্ম), মারগ (মার্গ), কলেশ (ক্লেশ), ভগন (ভগ্ন), উনমত (উন্মত্ত), সিতকার (সীৎকার), বিরকতি (বিরক্তি), চরবণ (চর্ব্বণ), খুবদ (ক্ষুব্ধ), নরতন (নর্ত্তন) বরজ (ব্রজ), ধৈরজ, ধীরজ (ধৈর্য্য), মূরতি (মূর্ত্তি)।

'ই'—লখিমি, লছিমি (লক্ষ্মী), হরিখ (হর্ষ), পরিযঙ্ক (পর্য্যঙ্ক), কিরিতি (কীর্ত্তি) মরিয়াদ (মর্য্যাদা)।

'উ'—খুবুধ (ক্ষুব্ধ), পুহুপ (<*পুষুপ<পুষ্প), পহুম (পদ্ম), মুগুধ (মুগ্ধ)।

[৫]

দ্বিত্বযুক্ত ব্যঞ্জনের একটীর লোপ হয়, এবং পূর্ব্বস্বরের ক্বচিৎ দীর্ঘতা-প্রাপ্তি হয়। যথা,—

ধিকার (ধিক্কার), উচ (উচ্চ), বিছেদ (বিচ্ছেদ), উতর (উত্তর), উতপত (উত্তপ্ত), উনমত (উন্মত্ত), উমত (<*উম্মত্ত<উন্মত্ত), বিপতি (বিপত্তি), অলত (<*অলত্ত<অলক্ত), অনুরত (<*অনুরত্ত<অনুরক্ত), সাধস (<*সাদ্ধস<সাধ্বস) সিধি (সিদ্ধি), বুধি (বুদ্ধি), শুধি (শুদ্ধি), উধ (উর্দ্ধ), উদণ্ড (উদ্দণ্ড), উদেশ (উদ্দেশ), ছন্দ (<*ছদ্দ<ছদ্ম), পলব (পল্লব), দুলহ (দুর্ল্লভ), উলাস (উল্লাস), উনিদ (উন্নিদ্র), ছিন (ছিন্ন), হিলোর (হিল্লোল)।

'ম' ব্যতীত কোন স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে 'শ', 'ষ' কিংবা 'স' প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা,—

নিচয় (নিশ্চয়), নিচুপ (নিশ্চুপ), নিচল (নিশ্চল), নিকরুণ (নিষ্করুণ), নিকলঙ্ক (নিষ্কলঙ্ক), খলত (<√স্খল্), অটমী (অষ্টমী), ওঠ (ওষ্ঠ), নঠ (নষ্ট), দিঠি (দৃষ্টি), শাতি (শান্তি), দুতর (দুস্তর), মধত (মধ্যস্থ), অথির (অস্থির), থল (স্থল), থেহ (স্থৈর্য্য), থাবর (স্থাবর), বিথার (বিস্তার), পরথাব (প্রস্তাব) থোর (<স্তোক) বিথুরল (<√বি+স্তৃ)।

'খ', 'ঘ', 'থ', 'ধ' ও 'ভ' পদমধ্যস্থিত হইলে অনেক সময় ইহাদের স্থানে 'হ' হয়। যথা,—

সহিনি (*সখিনী), মেহ (মেঘ), পাহুন (প্রাঘুণ), লহু (লঘু), নাহ (নাথ), সুনাহ (সুনাথ), বিহি (বিধি), পসাহন (প্রসাধন), মাহ (<*মাধ <মধ্য), শোহ (শোভা), দুলহ (দুর্লভ)।

আদিস্থিত না হইলে স-কারের স্থানে ক্বচিৎ 'হ' হয়। যথা,—মাহ (মাস), পুহু, (<*পুসুপ <পুষ্প), উছাহ (উচ্ছ্বাস)।

স্বরমধ্যস্থিত স্পর্শবর্ণের ক্বচিৎ লোপ ও তৎস্থানে য়-শ্রুতির আগম হয়। যথা,—

কনয় (কনক), কাতিয় (কার্ত্তিক), সায়র (সাগর), নায়র (নাগর), মযঙ্ক (মৃগাঙ্ক) রয়নি (রজনি), বয়ন (বদন), মযমত্ত (মদমত্ত)।

দুই একটী স্থলে 'গ' ও 'দ'-এর বিপর্য্যয় দেখা যায়। যথা,—

ভাগি (=পলাইল, পলাইয়া) এবং ভাজি ; ভিজি (=ভিজিয়া) এবং ভিগি ; ভাগি এবং ভাজি।

মৈথিলভাষাতে 'ষ'-কারের উচ্চারণ 'খ'-এর মত ছিল বলিয়া ব্রজবুলিতে প্রায়ই ষ-কারের স্থলে খ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পাউখ (প্রাবৃষ), দোখ (দোষ), রোখ (রোষ)। স-কারও ক্বচিৎ অন্য শব্দের প্রভাবে 'খ' হইয়া গিয়াছে। যথা,—তরখি (<√ত্রস্)— ; 'হরখি (<√হৃষ্)' এই শব্দের প্রভাবে।

র-ফলার প্রায়ই লোপ হয়। যথা,—চন্দ (চন্দ্র), গাহক (গ্রাহক), অনত (অন্যত্র), গুণগাম (গুণগ্রাম), পয়াগ (প্রয়াগ), পহরি (প্রহরী)।

ছন্দের অনুরোধে কখনও কখনও সংযুক্ত 'ন', (ক্বচিৎ 'ঙ' এবং 'ঞ') লুপ্ত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণকে আনুনাসিক করিয়া দেয়। যথা—

কাঁতি (কান্তি), ভাঁতি, ভরাঁতি (ভ্রান্তি), আঁগ (অঙ্গ), নিঁদ (<নিন্দ, নিদ্দা<নিদ্রা), মুঁদল (=মুন্দল <মুদ্রা), বিঁদু (বিন্দু), সঁচার (সঞ্চার), কঁচুক (কঞ্চুক), পাঁতর (প্রান্তর), শাঁতি (শান্তি)।

ছন্দের অনুরোধে কখনও কখনও শব্দাংশের লোপ হয়। যথা,—

মরন্দ (মকরন্দ), আন্দে (আনন্দে), অবগান (অবগাহন), প্রীতম (প্রিয়তম), জগ (জগৎ), বিদু (বিদ্যুৎ), অরু (অরুণ), আত (আতপ), অনুপ (অনুপম), দরশ (দরশন), গহ (গহন), অট্টালি (অট্টালিকা)।

[৬]

ব্রজবুলিতে শব্দের বহুবচনের স্বতন্ত্র রূপ নাই। বহুবচন করিতে হইলে সাধারণতঃ 'সব' এই শব্দের প্রয়োগ হয়, নতুবা বহুত্ববাচক কোন তৎসম শব্দের সহিত সমাস করিতে হয়। যথা,—

সখী সব (=সখীরা), হাম সব (=আমরা) ; সব সখী মেলি (=সখীরা মিলিয়া) ; সো সব দিন (=সেই দিনগুলি) ; সো কি কহব ইহ সখিনি-সমাজ (=সখীদিগকে) ; ঘাম-কুল (=ঘর্ম্মবিন্দু সকল) সঞ্চরু ; শুক-পিক-শারিক-পাঁতি ; সহচরি-কুল ; সখিগণ ; যুবতি-নিকর ; রঙ্গিনী-যূথ ; ভ্রমর-জাল ; পক্ষ-গণ ; দ্বিজ-কুল ; কোকিল-বৃন্দ ; সখি-মালা ; অলি-পুঞ্জ ; আরতি-রাশি ; সহচরি-মণ্ডলি।

কারক ছয়টী—কর্ত্তা (প্রথমা), কর্ম্ম-সম্প্রদান (দ্বিতীয়া-চতুর্থী). করণ (তৃতীয়া), অপাদান (পঞ্চমী), সম্বন্ধ (ষষ্ঠী) ও অধিকরণ (সপ্তমী)। প্রথমার বিভক্তি—'-এ', তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্তির লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়া-চতুর্থীর বিভক্তি—'-এ', '-কে' ; '-ক', '-কি' ; বিভক্তির লোপও বিরল নহে। তৃতীয়ার বিভক্তি—'-এ', '-হি' '-হিঁ', '-সেঁ (-সে)' ; বিভক্তির লোপও ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমীর বিভক্তি—'-হি', '-হিঁ', '-সেঁ', '-সোঁ', '-তেঁ (-তে)' ; বিভক্তির লোপও ক্বচিৎ দেখা যায়। ষষ্ঠীর বিভক্তি—'-ক (-কা)', '-কি', '-কে', '-কো', '-কর', '-র'। সপ্তমীর বিভক্তি—'-এ' '-হি', '-হিঁ', '-ওঁ', '-মে', '-মি' ; বিভক্তির লোপও বিরল নহে।

প্রথমা

বিভক্তিহীন প্রথমা—সুন্দরি, **মাধব** তুহে অনুরাগী ; **গোবিন্দদাস** কহই অব না শুনিয়ে **সঙ্কেত-মুরলী-নিসান** (কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা) ; জল বিনু **জলচর** নিমিখ না জীব। **চকোর** অমিয়া বিনু তিলেক না পীব।

বিভক্তিযুক্ত প্রথমা—দূরে রহু **ঘুমে** ; **রমণি-সমাজে** তোহারি গুণ ঘোষই ; **কিশলয়-মলয়জ-চন্দনে** দগধই।

তৃতীয়ার বিভক্তি '-হিঁ', '-হি' অনেক সময় প্রথমায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—**নামহিঁ** যাক অবশ করু অঙ্গ ; **ভকতহিঁ** মেলি ; মরমক বেদন **মরমহি** জানত। এই বিভক্তির সহিত অনেক স্থলে অবশ্য নিশ্চয়ার্থক অব্যয় 'হি' একীভূত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী

দ্বিতীয়া (-চতুর্থী) '-এ' বিভক্তি প্রথমা ও সপ্তমী বিভক্তি হইতে আসিয়াছে।—রে মন, কাহে করসি **অনুতাপে** ; পীতবাসে মোছই **রাই-মুখ-ঘামে** ; মাধব বধিলে কি সাধবি **সাধে** ; যাহে শির সোঁপি কোর পর শুতিয়ে সো যদি করু **বিপরীতে** ; **মাধবে** মিনতি জনায়বি মোয়।

'-ক', '-কি', '-কে' প্রভৃতি বিভক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে চতুর্থী (সম্প্রদান) বিভক্তি, উহারা পরে দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই জন্য অচেতন-বস্তু-বাচক শব্দে এই বিভক্তির

প্রয়োগ হয় না। যথা,—তুয়া ভানে (মূলে 'ভানে' স্থলে 'ভাবে' আছে ; তাহা স্পষ্টতঃই অসমীচীন পাঠ) **ভরু** দেই কোর। প্রাচীন মৈথিলভাষায় চতুর্থী বিভক্তি ছিল— '-কএ', '-কই', '-কেঁ' [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৫৩]

উদাহরণ,—**গোবিন্দদাসকে** কাহে উপেখি ; **রাইক** পরিহরি ; মৃদুতর-বচনে প্রবোধই **নাহক** ; **লাভকে** মূল হারাই ; কহল **লখিমীকি** বাত।

বিভক্তি-হীন দ্বিতীয়া-চতুর্থীর প্রয়োগ,—তোহে সোঁপলুঁ **রাই** ; কর জোড়ি রাই প্রণতি করু **দেবী** ; না যাইহ সো **পিয়া** ; যাকর দেহলী **ব্রজনি** গোঙায়লি ; সো কি কহব ইহ **সখিনি-সমাজ**।

তৃতীয়া

'-এ (-এঁ)' সংস্কৃত তৃতীয়া একবচনের বিভক্তি '-এন' হইতে আসিয়াছে ; '-হি' সংস্কৃত সর্ব্বনামের সপ্তমীর প্রত্যয় '-স্মিন্' অথবা পূর্ব্বতর আদি আর্য্যভাষার (সপ্তমীর) * '-ধি' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে ; '-হিঁ' সংস্কৃত তৃতীয়া বহুবচনের বিভক্তি '-ভিঃ' ও ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি '-নাম্' এই দুইয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৫১, ৫২]। '-সেঁ', '-সোঁ'—'সমম্' এই সংস্কৃত অব্যয় হইতে আসিয়াছে ; 'সঞে' শব্দেরও তৃতীয়াবাচক প্রয়োগ বিরল নয়, তবে ইহা পঞ্চমীতেই বেশী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কাব্যের ভাষার 'সনে'-ও এই 'সমম্' হইতে আসিয়াছে।

উদাহরণ,—বাহিরে **তিমিরে** না হেরি নিজ দেহ ; শূতলি নাগরি **নাগর-রাজে** ; **ইঙ্গিতভঙ্গিয়ে** দুহুঁ সব কহই ; **কানুসে** প্রেম বাঢ়াই ; **সখি সঞে** পুছত প্রেমকি বাত ; মুখ হেরি **লাজসোঁ** সায়রে লুকায়ল ; **করহি** নিবারত গোরি ; **কিরণহি** নিরগম বাধে ; **চন্দ্রাবলী সঞে** বিলসই মাধব।

বিভক্তিহীন তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ—**শীত** কিয়ে ভীতহিঁ ; সো ভিগি আওল **শাওন-মেহ**।

পঞ্চমী

'-হি', '-হিঁ' তৃতীয়া হইতে আসিয়াছে ; '-তে (-তেঁ)' (<সংস্কৃত'-ত্র+হি', বা '-ত্র+ধি') সপ্তমী হইতে আসিয়াছে। '-সেঁ (-সে)', '-সোঁ', '-সঞে', 'সঞ', এইগুলি সংস্কৃত 'সমম্' হইতে আসিয়াছে।

উদাহরণ,—**কুঞ্জসেঁ** নিকসে বহার ; অপন মালতিমাল **হিয়সেঁ** উতারি ; **গীমতে** (=গ্রীবা হইতে) ঢরকত ; **কুঞ্জহি** বাহির ভেল ; জনু বাঁধি ব্যাধা **বিপিনসোঁ** মৃগি তেজই তীখন খাস ; **কোরহিঁ** জোরি উবরি পুন সুন্দরি চললি তেজি বরনাহ ; **ঘর সঞে** ভেলি বহার ; **শেজ সঞে** উঠল ; **বনতেঁ** গিরিবর ঘর আওয়ে।

বিভক্তিহীন পঞ্চমীর দুই একটী উদাহরণ পাওয়া যায়,—তেয়ে **মধু-রাথ** ভিখ হাম লেয়ব ; অরুণবসন খসয়ে **গাত**।

ষষ্ঠী

'-ক' : হাথক দরপণ মাথক চূল ; কুণ্ডক মাহ ; মকরিপত্রক চিত্রক লেখ ; দুহুঁক প্রেম নাহি তুল।

'-কি (-কী)' : সুরভকি রীত ; মকরন্দপানকি লোভে ; অধরকি পানে ; মাঘকি মাস ; জেঊকি মাস ; হরিকি রিতিনিতি।

'-কে' : রূপকে কূপ ; বেণিকে লাবণি ; বৃষভানুনন্দিনিকে শোভা।

'-কো' : প্রিয়াকো।

দুইটী স্থলে '-হক' বিভক্তি পাওয়া যায়। যথা,—মুনিহক মানস ; নিবিহক বন্ধ। '-হ-ক' < সংস্কৃত ষষ্ঠী বিভক্তি '-স্য' + ব্রজবুলি বিভক্তি '-ক'।

'-কর' : পিয়াকর ; শৈলসুতাকর ; দুহুঁকর কেলি দরশক আশে।

ক্বচিৎ বিভক্তিহীন ষষ্ঠী পদ পাওয়া যায়। যথা,—পহিল সমাগম রাধা-কান ; গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি ; দশদিন দুরজন একদিন সুজনক।

সপ্তমী

'-এ' : বাহে (= বাহুতে) ; হিয়ে ; চুড়ে।

'-হি (-হিঁ)' : মনহি না ভাওত আন ; মণিময়হার-তরঙ্গিনী-তীরহি কুচ-কনকাচল ছায়, ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গোবিন্দদাস যশ গায় ; গোউহি মাঝহি করল পয়ান।

'-হুঁ' : যাহে বিনু জাগরে নিঁদহুঁ না জীবসি ; চিতহুঁ ; করহুঁ।

'-মে (-মি)' [<সংস্কৃত '-স্মিন্'] : জলমে ; কোটিমে ; কালিন্দি-কুলমে ; খনমি খনমি (খনমে খনমে ?) ; গিরিবরসান্ধিম (গিরিবর-সন্ধিমে ?)।

ব্রজবুলিতে বিভক্তিহীন সপ্তমীপদের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। প্রাচীন মৈথিল ভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ ছিল [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৫৫-৫৬]।

উদাহরণ,—যাকর দেহছলি রজনি গোঙায়লি ; পাণি রহল কুচ আপি ; পন্থ মিলব তুয়া কান ; বান্ধি রাখত পুন গেহ ; প্রেমলছমী নাচে নদীয়ানগরী ; অলসে আলিঙ্গনা শূতলি রাই ; কপটে ঘুমাওল ততি রহু ধরণী।

[৭]

ব্রজবুলি সর্বনামের বহুবচনে স্বতন্ত্র রূপ নাই। 'সব' এই শব্দের অনুপ্রয়োগ দ্বারা বহুবচনের কার্য সম্পন্ন হয়। 'হামরা' প্রভৃতি পদ বাঙ্গালার অনুকরণে অর্বাচীন ব্রজবুলিতে ঢুকিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বনাম : উত্তম পুরুষ

প্রথমা। **হাম (হম)**; **হামি (হমি)** [< হাম+আমি] : নিশি জাগরি হামি ; হমি পলটি বৈঠব ; **হামে** : কামসায়রে মরব হামে ; **মুঞে** (অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে চতুর্থী হইতে আসিয়াছে) : মুঞে কয়ল ; **মুঞি** (বাঙ্গালা হইতে অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে গৃহীত) : মুঞি জানহুঁ ; **মো** : কহল মো তোঁয়।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **মোয়** : অকপটে কহবি ন বঞ্চবি মোয় ; **মুঞো** : মুঞে ভেজল কান ; চঞ্চল নয়নে হেরি মুঞে সুন্দরী ; **মোহে** : মোহে ধনি তেজব ; সজনি কাহে মিনতি করু মোহে ; **হামে** : কান্দায়সি হামে ; হামে হেরি ; **হামা** : কটাখে নেহারত হামা।

তৃতীয়া। **মোয়** : মিলব মোয় ; **মোহে** : যদি মোহে না মিলব সো বররামা ; **হমে** : ওহি দিবস হমে মথুরা-সমাগম-পন্থহি দরশন ভেল।

ষষ্ঠী। **মঝু** (< সংস্কৃত 'মহ্যম্'— পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে) ; **মেরে** (হিন্দী হইতে) : মন্দিরে অব তুহুঁ চল মেরে কান ; **মোর** ; **মোহর** : ঐছন শ্যাম বিনু মোহর পরাণ ; **মোরি** ; **হামার (হমার)** ; **হামারি (হমারি)** ; **মোহরি** ; **মোয় (মোই)** : মরমক বেদন জানসি মোয় ; **মো** : তৈখনে হরব মো চেতনে ; **হামরা** (?) : চির ধরি পিয়ব অধররস হামরা ; **হামক** : হামক মন্দির যব আওব কান।

সপ্তমী। **মোহে** (?) : এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ।

সর্ব্বনাম : মধ্যম পুরুষ

প্রথমা। **তুহু, তুহুঁ** ; **তো** ; **তোই** ; **তু** : অকপটে এক বাত মুঞে কহবি তু।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **তোয়, তোই** ; **তোহে, তুহে**।

তৃতীয়া। **তোহে** : তোহে মিলায়লুঁ ; **তুয়া** : পন্থ মিলব তুয়া কান।

ষষ্ঠী। **তুয়া, তুয়** : কি খনে তুয় সনে লেহ করল হে ; **তোহে** ; **তুহাক** ; **তুহুঁক** ; **তুহার, তোহারি** ; **তুহুঁকর** : তুহুঁকর রীতহি ভীত অব পাওল ; **তোরা** : সুন্দরি দেহি পলটি দিঠি তোরা ; **তেরা, তেরি, তেরে** (হিন্দী হইতে আগত) : তেরে বধুহাথ ভিখ হাম লেয়ব।

সপ্তমী। **তোহে** : ধিক রহু সো ধনি তোহে অনুরাগ ; **তুহে** : সুন্দরি, মাধব তুহে অনুরাগী ; **তোহারি** (?) : হামারি বিশোয়াস তোহারি।

সর্ব্বনাম : প্রথমপুরুষ (সাধারণ)

প্রথমা। **সে** ; **সো** (পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে) ; **সেহ** ; **সেহি, সোয়** ; **ভহু** (?)।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। সো, সোই; তহি: তহি পুন হেরি; তহি; তাহে তাহ: অতএ সোঁপল তনু তাহ; যাবক-রঞ্জিত ও নখচন্দ্রক কাম রোয়ত তাহ রে।

তৃতীয়া। তায়: সারথি লেই মিলায়ব তায়।

ষষ্ঠী। তাক; তাকর; তছু (< সংস্কৃত 'তস্য'—পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); তহ্নিক, তিহ্নিক (সম্মানসূচক, = তাঁহার): অনুখন তহ্নিক সমাধি।

সপ্তমী। তাহে; তছু; তাহি; তহি, তাহ।

সর্ব্বনাম: প্রথমপুরুষ (বিদূর)

প্রথমা। উহ; ও, ওই, ওহি; উহ্নি (সম্মানসূচক = উনি): উহ্নি নিরাপদ গৌরিক সেবি; ওয়।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। উহে: উহে কি তেজিয়ে রে।

তৃতীয়া। উনসে (হিন্দী হইতে)।

ষষ্ঠী। ওর; উহ্নক, উহ্নিক, উহ্নকে (সম্মানসূচক = উঁহার); উন্‌কি (ঐ, হিন্দী হইতে): উন্‌কি শোহে গলে বনমালা।

সপ্তমী। উনহি [প্রথমা (?)]: ইন্‌কে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব; উনতে (হিন্দী হইতে): শাঙর চীত উনতে লাগিও।

সর্ব্বনাম: প্রথমপুরুষ (অদূর)

প্রথমা: এ; ইহ; এহ; এতহুঁ; এতনি (?); ইথে (?)।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। এতহুঁ।

ষষ্ঠী। আছু (<সংস্কৃত 'অস্য'—পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); আছুক; ইহ্নিক (সম্মানসূচক, = ইঁহার); ইন্‌কে, ইন্‌কি (ঐ, হিন্দী হইতে)।

সর্ব্বনাম: সম্বন্ধবাচক

প্রথমা। যে; যেহ; যো (পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); যোহি; যোই।

পঞ্চমী। যহাঁসেঁ (হিন্দী হইতে)।

ষষ্ঠী। যছু (সংস্কৃত 'যস্য'—পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); যছুকা; যাক, যাকে; যাঁক, যাঁকে (সম্মানসূচক, = যাঁহার); যাকর; যাহে।

সর্ব্বনাম: প্রশ্নবাচী

প্রথমা। কেহ, কেহু; কো (পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে), কোই; কোনে: বেকত লুকায়ত কোনে; কোন; কি, কিয়ে (কীয়ে) (অচেতন বস্তু বুঝাইতে)।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। কি (অচেতন বস্তু বুঝাইতে দ্বিতীয়ায়); কাহু: কাহু না উপেখি; কাহুকে; কাহি, কাহে; কাহ, কায়।

তৃতীয়া। কাহাঁ (সপ্তমী হইতে): উপমা দেয়ব কাঁহা।

ষষ্ঠী। কাহু (<সংস্কৃত 'কস্য') সজনি ঐছন হোয়ে জনি কাহ ; কাহ্ন ; কাহ্নক ; কাহুক ; কাহুঁকে ; কন্নুক (?) ; কা ; কাহে।

সপ্তমী। কাহাঁ ; কাহেঁ।

সর্ব্বনাম ঃ ক্রিয়াবিশেষণ

উত্তম ও মধ্যমপুরুষ ভিন্ন সকল সর্ব্বনাম হইতেই ক্রিয়াবিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতপক্ষে কারক পদ (যথা,—তেঁ, তেঞিও, কাহে, কিয়ে ইত্যাদি), অপরগুলি প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ।

'অতএব' অর্থে—তেঁ, তেঞিও, ইথে।

'তথায়' অর্থে—তহিঁ, ততহি, তাঁহা, তথি, ততিহুঁ, তাঁহি।

'এই সময়,' অর্থে—অব, অবহি।

'এই স্থানে' অর্থে,—ইথে, ইহ।

'যে স্থানে' অর্থে—যাহাঁ, যাহিঁ, যহিঁ, যথি।

'যে জন্য' অর্থে—যাহে, যথি।

'যে সময়ে' অর্থে—যব, যৈখনে।

'সে সময়ে' অর্থে—তব, তৈখনে, তহিঁ।

'যখন হইতে...তখন হইতে' অর্থে—যব (যা) ধরি,...তব (তা) ধরি, যব...তবহুঁ।

'কিজন্য' অর্থে—কাহে, কথি, কিয়ে।

'অথবা' অর্থে—কিয়ে।

'কোথায়' অর্থে—কথি, কথিহুঁ, কাহাঁ; কাহুঁ।

'কোন সময়' অর্থে—কব।

[৮]

ব্রজবুলিতে দুইটী স্ত্রীপ্রত্যয় আছে— -ইনী (-ইনি) এবং -ঈ (-ই), তন্মধ্যে প্রথমটাই প্রবল। '-ইনী (-ইনি)' জাতি, গুণ এবং কর্ম্মবাচক। বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে -'ঈ (-ই)' প্রত্যয় হয়, যথা,—আকুলি, চলী, টলী।

'-ইনী (-ইনি)'—চকোরিনি, ভুজগিনি, চটকিনি, মুগধিনি, পুলকিনি, সৌতিনি, লখিমিনি, উমতিনি, সতি-বরতিনি, কুল-বরতিনী, নটিনি, কুরূপিনি, গুণহিনি, আহিরিনি।

'-ঈ (-ই)'—উমতি, শাঙরি, পুতলী, অবনতবয়নী, মুগধি, গোঙারি, সাপী, নহুঙ-বদনী, গজগমনী, পিকবচনী, দেবতি, সুনাগরী।

ব্রজবুলিতে -ল প্রত্যয়ান্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গ-পদের বিশেষণ হইলে তাহা সাধারণতঃ স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন অবশ্য '-ইনী' প্রত্যয় না হইলে '-ঈ (-ই)' প্রত্যয় হয়। যথা,—মুরছলি গোরী ; (রাই) শুতলি আছলি ; লাজে লাজায়লি গোরি।

ব্রজবুলিতে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যাকরণানুগত নহে, স্বভাবানুগত। স্ত্রীলিঙ্গ ব্যক্তিলিঙ্গ সকল শব্দই পুংলিঙ্গ।

[৯]

ক্রিয়াপদের তিনটী কাল—বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। তিন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। কিন্তু একবচন ও বহুবচনের রূপের পার্থক্য নাই। বর্ত্তমান ও অতীত কালে প্রত্যেক পুরুষের একাধিক প্রত্যয় আছে।

বর্ত্তমান

উত্তমপুরুষের প্রত্যয়— -হুঁ (-হু),-উ (-উ), -ওঁ (-ও) [এইগুলি সংস্কৃত 'অহ < * 'হউ' হইতে আসিয়াছে]; -মো, -ঙ [এই দুইটী সংস্কৃত উত্তমপুরুষ পরস্মৈপদ্ বহুবচনের প্রত্যয় '-মঃ' হইতে আসিয়াছে]; -ই [সংস্কৃত উত্তমপুরুষ পরস্মৈপদ একবচনের প্রত্যয় '-মি' হইতে আসিয়াছে]; -ইয়ে [কর্ম্মবাচ্য দ্রষ্টব্য]; -অত, -অ [প্রথম পুরুষ দ্রষ্টব্য]। উদাহরণ,—

করহুঁ, প্রার্থহুঁ; সাধহু; যাউ, কহুঁ, করু, পূজউ, রহু; করোঁ; কহো, ভও, যাও; পূছমো; যাঙ, ঘুচাঙ, পরবোধঙ, পাঙ, হঙ, হেরঙ, পুছঙ; যাই, ভাখি, অনুভই, সোঙরি; নহিয়ে, যাইয়ে, পারিয়ে, অনুমানিয়ে, পড়িয়ে, পশিয়ে, নিবেদিয়ে, আছিয়ে, সাঁচিয়ে (= সঞ্চিত করি); ধরত, মাগত; জান, নহ, মান।

মধ্যমপুরুষের প্রত্যয়— -সি; -ই; -উ; -অ; -হ [অনুজ্ঞা দ্রষ্টব্য]। উদাহরণ,—

জানসি, মানসি, মেটসি, হেরসি, উতরোলসি, রহসি, পুছসি, করসি, তাপায়সি, কান্দায়সি, মুদসি, ঘোষসি; অনুমানি, যাই; করু, রহু; জান, রহ; বাঢ়াহ।

প্রথমপুরুষের প্রত্যয়— -অই; -ই; -অয়ে, -ওয়ে, -এ; -অত, -ত [সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে]; -অ ['-অই' প্রত্যয়ের 'ই' লোপ হইতে আসিয়াছে, অথবা অনুজ্ঞা হইতে আসিয়াছে, তুলনীয়—পুরীম্ অবস্কন্দ লুনীহি নন্দনম্ মুষাণ রত্নানি হরামরাঙ্গনাঃ। বিগৃহ্য চক্রে নমুচিদ্বিষা বলী য ইত্থমস্বাস্থ্যম্ অহর্দিবং দিবঃ॥ (শিশুপালবধ)]; -অহু [পূর্ব্বোক্ত '-অ'+নিপাত 'হুঁ']; উ [অতীতকাল হইতে আসিয়াছে]; -অন্ত [তৎসম প্রত্যয়]; -ন্তি [মৈথিল সম্মানসূচক প্রত্যয় '-থি'+তৎসম প্রত্যয় '-ন্তি']। উদাহরণ,—

করই, চলই, হসই, পুছই, ভণই; হোই, যাই, রোই, পরাই, সমঝাই, পাই, লেখি, কাপি, ভণিয়া (= ভণি+স্বার্থে '-আ'), জাগি, ধরি, পাতিয়াই, গড়াই, দেই, পড়ি, হেরি, হাসি, পেখি; আওয়ে, রচয়ে, বৈঠয়ে, আছয়ে, উগয়ে, গণিয়ে (কর্ম্মবাচ্য), ভাওয়ে, ধাওয়ে, নাচাওয়ে, খাওয়ে, ইছয়ে; বৈঠে, ইছে, চলে; নৃত্যত, চলত, দেত, লেত, যেওত, নাচাওত; আছ [প্রাচীন মৈথিল 'অছ': শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৬০], কহ, খেলি, গুঞ্জ, গাথ (গাও), চাহ, জাগ, ফুর, ভণ, রহ, সহ, সাজ, দেখ, পরশংস, সঙ্কুচ, চুম্ব, অবগাহ, ভাষ, পরকাশ, রম, মান, শোহ, হাস; ভণহু, লেপহু, খেপহু, নিন্দহু, দেখহু; করু, ঝঙ্করু, রহুঁ (আনুনাসিক সম্মানসূচক) রহু, লিখু, সঞ্চরু, চলু, জাগু, অছু, ধরু, সহু, কহু, নিঃসরু, অভিসরু; গরজন্তি, বিছুরন্তিয়া (+স্বার্থে '-আ') বরিখন্তিয়া (+স্বার্থে '-আ'); নিবসন্তি, পরশন্তি, হোন্তি,

গুঞ্জতি, যাতি, মিলাতি, যাতিয়া (+ স্বার্থে '-আ'), ধরতি, পড়তি, বদতি, ভণতি, নটতি, মীলতি।

অতীত

ধাতুতে -অল (-ল) প্রত্যয় যোগ করিয়া ব্রজবুলিতে অতীত verb stem বা ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। এই প্রত্যয় মূলতঃ বিশেষণ প্রত্যয়, সেই কারণে কর্তৃপদ স্ত্রীবাচক হইলে ক্রিয়াপদে স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ হয়। বাঙ্গালার প্রভাবে অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে স্ত্রী-প্রত্যয় প্রায়ই হইত না।

-অল ছাড়া ব্রজবুলিতে মাগধী হইতে প্রাপ্ত আরও একটী অতীত প্রত্যয় ছিল -ই, ইহা সংস্কৃত '-ক্ত' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। এই প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—আই, উভারি, গই, জাগি, দংশি, পলটাই, পুরি, বিহসি নেহারি। তবে প্রথমপুরুষেই বেশী প্রযুক্ত হইত।

-ও প্রত্যয়ান্ত অতীত ব্রজবুলিতে হিন্দী হইতে আসিয়াছে। যথা,—গও, গেও (গতঃ); ভেও, ভও (ভূতঃ); লিয়ো ; কিয় (কৃতঃ)। ইহার উত্তম ও মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ পাওয়া যায় না।

-উ প্রত্যয়ান্ত অতীত পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে আসিয়াছে। ইহার মূলেও সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয় [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Varnaratnakara, পৃঃ ৬২]। ইহারও উত্তম এবং মধ্যমপুরুষে প্রয়োগ দেখা যায় না। উদাহরণ,—ধরু, রহু, পড়, অন্তরু, হেরু, করু, লেখু, মীলু।

-অল প্রত্যয়যুক্ত অতীতের উত্তমপুরুষের বিভক্তি— -উ (<অহম্) এবং -ম (= 'মো' = আমি) প্রথমপুরুষের দৃষ্টান্তে প্রত্যয়হীনতাও দৃষ্ট হয়। উদাহরণ,—গেলুঁ, পেখলুঁ, জীয়লুঁ ; বুঝলম, কহলম ; অছল, দেল, কয়ল।

মধ্যমপুরুষের বিভক্তি— -লি। যথা,—আওলি, পরিপোষলি, আছলি।

প্রথমপুরুষের কোন বিভক্তি নাই। যথা,—আছল, ছল ; দেল, রহল, নেল ; কয়ল, কেল ; স্ত্রীলিঙ্গে—আছলি, কহলি, শুতলি, নিঁদায়লি।

তিন পুরুষেই ক্বচিৎ -লা প্রত্যয় দেখা যায়। যথা,— ভেলা, ভুললা, ছিলা ; গণলা, কহলা। এই '-আ' এর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ '-আহ' প্রাচীন মৈথিলে পাওয়া যায় (ইহা সম্মানসূচক বহুবচনের বিভক্তি) [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৬১]। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই (সম্মান সূচক)—'-আ (লা)' প্রথমপুরুষেই দেখা যায়।

-অল অতীতের সহিত প্রায়ই স্বার্থে বা নিশ্চয়ার্থে 'হি', 'হুঁ' নিপাতের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—ভেলহি, চললিহুঁ, ধরলহি, দেলহি।

বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের অতীতকালে প্রয়োগ বিরল নহে।

ভবিষ্যৎ

উত্তমপুরুষের বিভক্তি— -ব ; -বি (স্ত্রীপ্রত্যয়ের '-ই' ?)। উদাহরণ—করব, দেয়ব, বোলব ; দেবি, নেবি [পদকল্পতরু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯]।

মধ্যমপুরুষের বিভক্তি— -বি। যথা,—বৈঠবি, করবি, মোড়বি, ঝাঁপবি।

প্রথমপুরুষের বিভক্তি— -ব, -বে। যথা,—মিলায়ব, হব, ধরবহি (+'হি'); ধরবে, করবে [পদকল্পতরু, ঐ]।

[১০]

অনুজ্ঞা

অনুজ্ঞার দুইটী রূপ আছে—(১) সাধারণ অনুজ্ঞা, (২) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

সাধারণ অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষের প্রত্যয়—-অ, -হ। যথা, —নহ, কর, বদ, চল; মীলহ, শুনহ, হেরহ, চলহ, ভেটহ, সমুঝহ।

প্রথমপুরুষের প্রত্যয়— -আউ, -উ। মেটউ, বন্ধউ, সেবউ, পীবউ, সমুঝউ, রাখউ, চলউ, হসউ; রহু, রহুক (+'ক' স্বার্থে), যাউ, ধরু, করু।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রত্যয় (কেবল মধ্যমপুরুষেই প্রয়োগ আছে) -ইহ। যথা,—যাইহ, করিহ, পুরাইহ।

[১১]

কর্ম্মবাচ্য

কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে।

লীলাকমলে ভ্রমরা কিয়ে ব্যারি (<'বারিতঃ'—'বার্য্যতে'); ঐছন প্রেম কথিহুঁ না হেরিয়ে; বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ; কছু নাহি দীশই ('দৃশ্যতে'); এমন পিরিতি আর কথিহুঁ না পেখিয়ে; নাহ-আরতি যত কহন ন হোয়; যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন যাই। ভণত ন আওত।

[১২]

ণিজন্ত ক্রিয়া

ধাতুতে -আয় (-আও) প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রযোজ্য ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। যথা—শিখায়ব, পঠাওল, বাঢ়ায়সি, জনায়ই, কহায়সি।

[১৩]

নাম-ধাতু

ব্রজবুলিতে নামধাতুর প্রয়োগ অত্যধিক। নামধাতুর কোন বিশিষ্ট প্রত্যয় নাই। যে কোন তৎসম বা অর্দ্ধতৎসম শব্দ ব্রজবুলিতে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,—উমতায়লি (<'উন্মত্ত'); সিধায়ব (<'সিদ্ধ'); অনুমানল (<'অনুমান'); সম্বাদল (<'সংবাদ'); অনুলেপই (<'অনুলেপ'); বিলম্বায়ত (<'বিলম্ব'); পরলাপসি (<'প্রলাপ'); পরিবাদসি (<'পরিবাদ'); অর্ব্বাঞ্চই (<'অর্ব্বাচ্'); বিষাদই (<'বিষাদ'); সিতকারই (<'সীৎকার'); শ্রুতি-অবতংসহ (<'শ্রুত্যবতংস')।

[১৪]

অসমাপিকা

অসমাপিকার দুইটী প্রত্যয়—(১) -ই (-অই), এবং (২) -অ; তন্মধ্যে প্রথমটীই প্রবল। উদাহরণ,—

দেখি ; ছাপাই ; দরখি, দরশি ; ভোরি ; আই, আয় ; ভই ; গোই, গোয় ; পী, পিবি ; আপি ; রোষাই ; লাই, লাগি ; বিসরি ; লুবুধাই ; বিম্বুকাই ; অলসাই ; হরখি ; পহিরি ; পাই ; পরবোধিয়া (+'আ' স্বার্থে) ; মাতিয়া (+'আ' স্বার্থে) ; বোলই, শ্লাঘই, তোড়ই ; ধরই, নিরখই, বুঝই, রোপই, শুনই, করই ; মোর ; ভর ; মেল ; ঝাঁপ ; তেজ ; গুঞ্জ ; জাগ ; জান।

প্রকৃত অসমাপিকা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্রিয়াপদও অসমাপিকার অর্থে কখনও কখনও প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। যথা—

রাইমুখে শুনলহি ঐছন বোল। সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥

করইতে গমন ভেল উপনীত।

জ্ঞানদাস কহ ও রূপ **হেরইতে** কো ধনি ধরু নিজ দেহ।

শুনতহিঁ জাগি পুনহু পহু ঘুমল।

[১৫]

তুমর্থ-ভাববচন

তুমর্থ-ভাববচনের একাধিক প্রত্যয় আছে— **-অইতে** (মৈথিল '-অইত' <সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়), **-অত** (<সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়); **- অই, -উ**। উদাহরণ,—

চলইতে, জিবইতে, ধরইতে, ভেটইতে ; আগোরত [পদকল্পতরু, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৯৩], উঠত, দেওত, পরিখত ; সহই, কইই, করই, বহই, পীবই, বুঝই ; সহু [ঐ, পৃঃ ১১৫]।

[১৬]

শতৃবোধক-অসমাপিকা

শতৃর্থ-অসমাপিকার প্রত্যয় **-অত** (সংস্কৃত শতৃ-প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে)। যথা,— জপত, চলত, খলত, উঠত। **-অইতে** (**-অইত**) প্রত্যয়ও হয়।

[১৭]

ব্রজবুলির সমাস সংস্কৃতানুযায়ী। তবে ছন্দের অনুরোধে পূর্ব্ব-নিপাতের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—না বুঝলুঁ **অন্তর-নারী** (=নারী-অন্তর) ; তুহুঁ বড়ি **হৃদয়-পাষাণ** (=পাষাণ-হৃদয়) ; নৃপ-আসন থেতরি মাহা বৈঠত **সঙ্গহি ভকত-সমাজ** (=ভকত-সমাজ-সঙ্গহি) ; **কবিগণ** চমকয়ে **চীত** (=কবিগণ-চীত) ; **হার-উর** (=উর-হার)।

[১৮]

সংস্কৃত '-ইমন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্রজবুলিতে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—নীলিম বাস ; পীতিম চীর ; মধুরিম নাম ; মধুরিম হাস ; গুণহিঁ গরীম ; ত্রিভঙ্গিম ঠাম ; রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া ; বঙ্কিম ভঙ্গি ; চতুরিম বাণী।

সংস্কৃত '-ক্ত' প্রত্যয়ের (বিশেষণ) অর্থে ব্রজবুলিতে **-অল** প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

এবং এই প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী প্রত্যয় -ঈ (-ই) গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা,—ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি ; নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব ; মুরছলি গোরি।

ভাবার্থে বা কার্য্যার্থে ব্রজবুলিতে -পন (তদ্ধিত) প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালায় এই প্রত্যয় নারীর ভাষায় পর্য্যবসিত [শ্রীসুকুমার সেন, Women's Dialect in Bengali (Journal of the Department of Letters, Vol. xviii), Calcutta University, পৃঃ ২৮]। যথা,—রসিকপন, চতুরপন, সতীপন, নিঠুরপন, শঠপন।

ভাবার্থে তদ্ধিত -আই প্রত্যয় হয়। যথা,—নিঠুরাই, চতুরাই, মধুরাই, বাধাই, অধিকাই, লুবধাই, শুতাই।

[১৯]

জনি (<'যৎ+ন') নিষেধার্থক অব্যয়। যথা,—ভূলহ জনি পাঁচবাণ ; জনি তুহু হাস ; ও তিন আঁখর মনে জনি রাখসি সপনে করসি জনি সঙ্গ ; সজনী ঐছন হোয়ে জনি কাহ। ভোজপুরিয়া ভাষায় এই শব্দ 'জিন' রূপে পাওয়া যায়।

জনু (<'যৎ+নু') উপমাদ্যোতক অব্যয়। যথা,—পাকল ভেল জনু ফল সহকার ; কেসরি জনু গজকুম্ভ বিদারি।

[২০]

নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে ব্রজবুলিতে যুক্ত-ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বুঝা যাইবে।

'বাঢ়া' : ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়ায়লি ; মিছই বাঢ়ায়সি মান ; নাহক আদর অধিক বাঢ়ায় ; কাহে বাঢ়ায়লি বাত ; বিঘন বাঢ়াওসি ; কাহে বাঢ়ায়সি খেদে ; কলহ বাঢ়ায়বি।

'রচ' : রচই সিতকার ; অব তুহুঁ বিরচহ সো পরবন্ধ।

'বাঁধ' : নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই ; জিউ বান্ধব ; কথিহুঁ না বাঁধই থেহ ; বচন না বান্ধবি।

'মান' : না মানয়ে বোধ ; কাহে তুহুঁ মানসি লাজে ; রোখ মানসি ; নাহি মানে ভীতে ; মান মানসি ; প্রাণ পিরিতি-বশ নিরোধ না মান।

'দঢ়া' : যুগতি দঢ়াই।

'রোপ' : তাহে না রোপলুঁ কান ; আরোপলি নয়ন-চকোর।

'সাধ' : তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান ; সাধসি মানে ; সাধই দান ; সাধবি সাধে।

'বাস' : বাসই লাজ।

'ধর' : মান ধরলি করি যতনে ; মান গুরুয়া কাহে ধয়লি।

'হো', 'যা' (কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ) : করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যায় ; হৃদয় জুড়ন ন গেলা ; মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়।

[২১]

'রহ' ও 'আছ' ধাতুর যোগে ক্রিয়ার continuity বা ব্যাপ্তি সূচিত হয়। মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা ছাড়া অন্যান্য রূপও হইতে পারে। উদাহরণ,—

সজল নয়নে রহু হেরি ; যব হাম রহল নেহার ; আছইতে আছল কাঞ্চন-পুতলা একলি আছিলুঁ হাম বলইতে বেশ।

[২২]

এই স্থানে ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি-বিচার করা হইতেছে।

আগোর, আগর

এই কথাটি ব্রজবুলিতে বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষণ হইলে 'আগোর' 'আগর' শব্দের অর্থ 'অগ্রগণ্য', স্ত্রীলিঙ্গে 'আগোরী' 'আগরী'—'অগ্রগণ্যা'। যথা—শুন শুন নাগর সব গুণ-আগর ; এক অনুরাগ -সোহাগহি আগার। আগর, আগোর <অগ্র+র (ল) ; তুলনীয় বাঙ্গালা 'আগল'—'নিত্যানন্দ-অবধূত সভাতে আগল'। 'আগোর' শব্দের এক গৌণ অর্থ 'বিহ্বল'—তখন ইহাতে 'আকুল' এই শব্দের মিশ্রণ হইয়াছে। যথা,—হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর ; পরিমল-লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর।

যখন ক্রিয়ারূপে 'আগোর' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার অর্থ 'বন্ধ করা, আবৃত করা, বাধা দেওয়া'। যথা—রঙ্গিনিমুখ নিশি বাসর আগোরলি ; হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি ; জনু রাহু চাঁদে আগোরল ; চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥ এখানে 'আগোর' <'অর্গল', নামধাতু রূপে ব্যবহৃত।

আগুনি

'ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি। জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥' —ইত্যাদি স্থলে 'আগুনি' শব্দের অর্থ সকলেই 'অগ্নি' করিয়া থাকেন (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী [চয়ন]' পৃঃ ৭৩, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'ভেজ' ধাতুর অর্থ 'দ্বারাদি বন্ধ করা'—এই অর্থে এই ধাতুর প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে—'অগ্নি প্রদান, বা জ্বালান' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ কুত্রাপি নাই। এই স্থলে 'আগুনি' শব্দের অর্থ 'খিল'। ইহার যথার্থ ব্যুৎপত্তি 'আগুনি = আগুলি<অর্গলিকা'।

'আনল'

'আনল ভেজাই ঘরে'—ইত্যাদি স্থলেও সকলে 'ভেজাই আগুনি' ইহার মত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহাও ঠিক মনে হয় না। 'আনল' পাঠ শুদ্ধ নহে। ইহা আগল (<অর্গল) হইবে। পূর্ব্বোক্ত 'আগুনি (= আগুলি)' শব্দের সাহায্যেই এই ভ্রান্ত পাঠের সূত্রপাত হইয়াছে।

সাঙ্গাতি, সাঙ্গাত (সাঙ্ঘাত)

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় 'সাঙ্গাত, সাঙ্গাতি' শব্দ প্রচলিত আছে। ব্রজবুলিতে

ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম-সাঙ্খাতি; নিরজন জানি কানু তহিঁ উপনিত সহচর সুবল সাঙ্গাত। 'সংঘ' শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। 'ডাকাইত', 'সেবাইত (<সেবাবৃত্তক' ?) প্রভৃতি শব্দের আদর্শে 'সাঙ্খাইত> সাঙ্খাত> সাঙ্গাত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'সংঘমিত্র' শব্দটী এই সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সাঙ্গাত, < সঙ্গ+আ(ই)ত [Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৬৬৩]।

সুলেহ, সুনেহ

সুনেহ (সুলেহ) = সনেহ < স্নেহ; সুনাগর, সুনাহ (< সুনাথ) প্রভৃতি শব্দের প্রভাবে এবং তৎসম 'সু' শব্দের অর্থের প্রভাবে 'সনেহ' 'সুলেহ' হইয়াছে।

বিজ

ব্রজবুলিতে গমনার্থক একটী 'বিজ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে, যথা,—বিজই, বিজহ ইত্যাদি। ইহা সংস্কৃত 'বিজয়' (= রাজার জয়যাত্রা) হইতে আসিয়াছে। তুলনীয় সংস্কৃত 'বিজয়স্কন্ধাবার,' 'বিজয়রাজ্যে' > প্রাচীন উড়িয়া 'বিজে রাজ্যে'। সংস্কৃত 'ব্রজ্' ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীসুকুমার সেন।

শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ*

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহের কাজ অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সম্ভবতঃ ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে তাঁহার সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পরে উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায় মধ্যে মধ্যে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার পল্লীশব্দসংগ্রহ প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। এখনও সকল জেলার শব্দ সংগ্রহ হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে এটী অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্য। সদীয় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাধিক বার লেখা দ্বারা এবং মুখে ইহার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টা এবং উপদেশে বিগত কিছুদিন যাবৎ কেহ কেহ শব্দসংগ্রহ কাজটী অনেকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে করিতে চেষ্টা করিতেছেন; ও তাঁহারই নির্দ্দেশমত Sir G. A. Grierson সাহেবের Bihar Peasant Life-এর প্রণালীর অনুকরণে বাঙ্গালার পল্লীশব্দসংগ্রহ হইতেছে। ঐ প্রণালী বাস্তবিকই সুন্দর ও কার্য্যকরী। ঐ প্রণালীতে শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহমদ মোল্লা বেশ সুন্দররূপে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার গীতগ্রামের শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ অনেক দিন যাবৎই সংগ্রহ করিতেছি; কিন্তু শব্দের তো সীমা নাই, কাজেই এখন পর্য্যন্ত যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়া দিলাম। আমার বর্ত্তমান সংগ্রহ হবিগঞ্জ মহকুমার উত্তর ও পূর্ব্ব এবং মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমদিকের গ্রাম্য ভাষার উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। তবে শ্রীহট্ট সদর এবং করিমগঞ্জ মহকুমারও কোন কোন গ্রামের শব্দ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বর্ত্তমান সংগ্রহেও যতদূর সম্ভব গ্রিয়ার্সন সাহেবের প্রণালীর প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টের উচ্চারণ প্রণালীরও কতকটা বিশেষত্ব আছে। সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সে জন্য এখানে আর পৃথক্ ভাবে করা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষিকর্ম্ম সংক্রান্ত শব্দ

১। জমির প্রকার ভেদ—

ভুই, খেৎ, জমি = চাষের ভূমি।

পতিত জমি, খিল = যে জমি পূর্ব্বে কখনও চাষ করা হয় নাই।

বিচ্‌রা = বাড়ীর সংলগ্ন ফসলাদি উৎপাদনের উপযুক্ত ভূমি।

টুমা = জমির টুকরা (যেমন এক কেরী টুমা) (ডুমা, বরিশাল)

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৭শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

২। সীমা,—

আইল = আলি (তুলনীয় —হিন্দী আর, আরি কিম্বা আরী ; আইল, আল— গয়া ও মুঙ্গের জিলার বিহারী ভাষায়)।

রাজ্ আইল = বড় আলি, যাহার উপর দিয়া লোক চলাচল করে (তুলনীয়—রাজপথ)।

খাল, নালা = খাল।

বান, বান্ধ্ = বাঁধ।

তেমনিয়া, তেমন্তা, তিকাটি (করিমগঞ্জ) = তিন সীমার মিলনস্থান।

চৌমন্তা (নিয়া), চৌমনি (না) = চারি সীমার মিলনস্থান।

ধুর = দুই জমির ধানের মধ্যের ফাঁক ; দুই টিলার মধ্যের ছোট রাস্তা (ফেঁচুগঞ্জ)।

। চাষের আসবাব পত্র—

লাঙ্গল।

জুআল = জোয়াল।

কুদাল = কোদাল।

পাজুন, পাজইন = গোতাড়ন যষ্টি।

চৌকাম, মই = মই (৪ খিলবিশিষ্ট মই চৌকাম, ৬ খিলবিশিষ্ট মই, শ্রীহট্ট সদর)।

দড়া = মোটা দড়ি।

খন্তা = মাটি খননের যন্ত্র, কুরপি (করিমগঞ্জ)।

কুন্দ = ক্ষেত্রে জলসেচনের কাষ্ঠনির্ম্মিত লম্বাকৃতি সেচনীবিশেষ।

হেঅইং, হেঅং = জলসেচনের ত্রিকোণাকৃতি সেচনীবিশেষ (করিমগঞ্জ সদর)।

৪। ফসল রক্ষা ও কর্ত্তনের আসবাব—

ছেল, জাটা = অস্ত্রবিশেষ।

উগার, টঙ্গ্ = বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষেত্ররক্ষকদের রাত্রিতে অবস্থানের নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চবিশেষ।

টাক = শূকর প্রভৃতি পশু তাড়াইবার জন্য বংশার্দ্ধ-নির্ম্মিত শব্দকারী যন্ত্রবিশেষ।

ছুলপি = লৌহনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রবিশেষ।

কাচি = ধান কাটার অস্ত্র, কাস্তে।

জুত = সরু দড়ি, ধান কাটার পর বাঁধিতে ইহা লাগে, (তুলনীয় পালি, যোত্তানি)।

রাউজ্ = দড়ি (করিমগঞ্জ ; < রজ্জু)।

বেউ, বাঙ্গ্ = ধান্য বহনের বংশনির্ম্মিত দণ্ড (করিমগঞ্জ সদর)

হুজা = ধান্য বহনোপযোগী সূক্ষ্মাগ্র বংশদণ্ড।

৫। চাষের কার্য্যে ব্যবহৃত জন্তু—

হাড় = ষাঁড়।

বিচাল, ভুলুয়া (করিমগঞ্জ অঞ্চল) = লড়াই করাইবার জন্য যে ষাঁড় পোষা হয়।

বলদ, দামা = বলদ।

দামা ছাও = ছোট বলদ।

ডেকা = বৃষ।

ডেকী = প্রসবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত গাভীকে ডেকী বলা হয়।

বাঞ্জুয়া ডেকী = বন্ধ্যা ডেকী।

বয়রা, ভইস্, মইষ = মহিষ।

কাক্‌নি = স্ত্রীমহিষ।

৬। কৃষির সরঞ্জামের অংশভেদ—

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ—

ইশ্‌ = লম্বা কাষ্ঠখণ্ড।

ফাল = লৌহনির্ম্মিত ধারাল ছোট কোদালের মত, যাহাদ্বারা ভূমি কর্ষণ হয়।

জোয়ালের বিভিন্ন অংশ—

হইল, হালি (করিমগঞ্জ) = সলি।

হড়্‌কি = জোয়ালের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কাষ্ঠ কিম্বা বংশখণ্ড।

আন = জোয়ালের মধ্যের লাঙ্গল আটকাইবার দড়ি।

৭। কৃষিকর্ম্ম ও কর্ম্মী,—

হাল তোলন লামানি = শুভ দিন দেখিয়া প্রথম হল চালন করা। এদিন পূজাদিও হয়।

হাল বাওয়া = চাষ করা।

বাইন করা = বপন করা।

পালট = লাঙ্গলের লম্বা লম্বা অঙ্কিত রেখা।

চাদেওয়া = চাষ করা।

হালুচা = কৃষক, চাষা।

চা (হ্‌) = চাষা। ইহাকে সাধারণতঃ রোজ রোজ পয়সা দিয়া চাষ করাইতে হয়। খাদ্য দিতে হয় না। যাহাদিগকে খাদ্য দিতে হয় ও মাহিনা দিতে হয়, তাহাদিগকে 'হালুচা' বলে।

বাছা উল = যাহারা জমির আগাছা বাছিয়া ফেলে।

বাইন উমানি = বপন শেষ করিয়া মই দিয়া ক্ষেত সমান করিয়া দেওয়া।

বাইন বাত্‌নি = ক্ষেতে জল জমাইয়া ২।৩ দিন আবদ্ধ রাখিয়া অন্য ঘাস ও তৃণ পচাইয়া জমি শস্য বপনের উপযোগী করা।

কাম্‌লা = কর্ম্মী।

রাখাউল, রাক্‌খুয়াল, রাখাল = গোরুর রাখাল।

বালা = বদল কর্ম্মী (একজনের সাহায্যে অন্য জন কাজ করিলে উপকৃত ব্যক্তি নিজে আবার সমান পরিশ্রম করিয়া তাহা শোধ করে,—এই প্রথাকে 'বালা' বলা হয়।

অজ = বদলী ; গরু কিম্বা মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই 'অজ' হইতে পারে। 'বালা' শুধু চাষের বেলায় হয় ; কিন্তু 'অজ' সাধারণ পরিবর্ত্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (যেমন,চাউল আজাইয়া আন,

বারি = পালা (জমির পাহারা দিবার)।

রাখালি = মাঠের ক্ষেত পাহারা দেওয়া।

পরদেও = পাহাড়ের ক্ষেতে রাত্রে পাহারা দেওয়া।

মড়ল, পাটাদার (করিমগঞ্জ) = মণ্ডল, কৃষকেরা শস্য বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যে জমিদারের খাজানা আদায় করিয়া লয়।

কাটাউল = যাহারা পয়সা লইয়া ধান কাটে।

দাওয়াউল = যাহারা পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে ধানই লয় (তুলনীয়—দাঐল, বরিশাল)

দাওয়া = ধানের জন্য ধান কাটা। তুলনীয়—পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ (শূন্যপুরাণ)।

লুড়াউল = যাহারা ধান কাটা হইয়া গেলে পরিত্যক্ত ধান্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইংরেজী—*Gleaner* (লুড়া = কুড়ানো ধান, gleanings ; তুলনীয়—লোটা, চম্পারণ জেলা)

মাড়া দেওয়া = গোরুর সাহায্যে ধান গাছ হইতে ধান পৃথক্ করা।

উয়ানি = বাতাসের সাহায্যে আবর্জ্জনা হইতে ধান্য পৃথক করা; ইংরেজী—winnowing.

বীচধান = বীজের ধান।

হালি = অঙ্কুরিত ধান্যের গাছ, স্থানান্তরে রোপণের জন্য যাহা জন্মান হয়।

হালি বিচরা = যে স্থানে হালি জন্মান হয়। (বিচ্‌রা—দক্ষিণ ভাগলপুরে)।

চুচা (ধান) = যাহার সার নাই ও কখনও অঙ্কুরিত হয় না। (তুলনীয়—চিটা বরিশাল)।

আঁটি, আটি, আটা = ধানের আঁটি।

আজার = আঁটির অংশবিশেষ।

(হালি) রুআ = ধান্যরোপণ।

রুআউল = রোপণকারী।

(ধানের) পারা = একত্র সাজানো কাটা ধান।

ঢেরী, তুপ (করিমগঞ্জ) = ধানের স্তূপ।

খের = খড়।

তুষ, চুকন = চাউলের বাহিরের আবরণ।

ধান্যের বিভাগ

বাট = ক্ষেত্রস্বামী ও চাষার মধ্যে বিভাগ (তুলনীয়—বাঁট, চম্পারণ ও গয়া)

ভাগী জমি, বাগী = যে জমির কর ধান্য দ্বারা দিতে হয়। কিন্তু যে জমির কর মুদ্রায় দিতে হয় তাহাকে 'খাজনাই জমি' বলে।

চুক্তি বাগী = যে জমির করস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য দিতে হয়।

আধিয়া বাগী, আদ্যা(ধ্যা) আধা = যে জমির ধান অর্দ্ধেক ভূস্বামী ও অর্দ্ধেক কৃষক পায়।

তেভাগী = যে জমির ফসল ⅓ জমিদার ও ⅔ কৃষক পায়।

চৌথাই = যে জমির ধান ¼ জমিদার ও ¾ কৃষক পায়।

কেওয়াল, কেআল = যে ধান ওজন করে।

পরিমাণের দ্রব্য

সে(হে)র, পুরা, কাটি, পালি, ভুতা, পাইলা।

বীজবপনের প্রকার ভেদ

ধুল্যা বাইন = শুষ্ক জমিতে (ধূলির মধ্যে) বীজবপন।

পেকী বাইন = কাদার মধ্যে বীজবপন।

ছিট(টা) মারা = উপযুক্ত রূপে চাষ না করিয়াই বীজ ছড়াইয়া দেওয়া (তুলনীয়—ছিট্টা, ছিটুআ, বিহার)

ধান্যের প্রকারভেদ

আড়াই, দুমাই = দুইমাস কিম্বা আড়াই মাসে যে ধান্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে।

চেংরি = চৈত্র—আষাঢ়, এই ৩ মাসে হয়।

কাতারি = অগ্রহায়ণ মাসে হয়। কাতারি নানা রকম যথা,- লাকি ; বাজাই ; বাদাল—১। বুরা বাদাল। ২। মুগ বাদাল। কাতি-বাগদার ; বিরইন ; ছিরমইন।

আমন—আমন ধান নানা প্রকারের, যথা—কচু ; মাটিয়া ; লাল ; কালা ; সুনার টেকই ; গড়িয়া ; উরুলা ; মেতি ; পরিছুক ; হুপানি ; জুয়াল ভাঙ্গা।

বিরইনের প্রকারভেদ,—কাতি ; সুনা ; পুটি ; বর্ম্মা ; কালি।

কাইল—ইহা নানা প্রকার, যথা,—লাটি বা লাট্যা সা(হা)ইল ; ঠাকুরভোগ ; বাইঙ্গন বীচি ; কালিজিরা ; মেতি চিকণ ; বীর পাক ; দু(ধ)রাজ ; বালাম ; ভেড়া পাওয়া (করিমগঞ্জ) ; সায়েব সা(হা)ইল ; বুর ধান ; টুপা বুর ; খইয়া বুর।

মনুষ্যদেহ

মুড়ি, মুড় = মাথা।

খিরু(য়া) = মস্তিষ্ক।

চউখ = চক্ষু।

থুতা = চিবুক।

রগ = শিরা।

বুনি = স্তন, স্তন্য।

চুপা = মুখ (নিন্দার্থে) [চুপাকরা = মুখে মুখে উত্তর দেওয়া]।

আটু = হাঁটু (আসামী—আঠু)।

মুড়া = গোড়ালি।

নাই = নাভী।

ঘাড় = কাঁধ।

উরাৎ = উরু।

লাইড় = নিতম্ব।

ড্যানা = বাহু।

মাড়ইল হাড় বা মাড়ল্যা = মেরুদণ্ড।

কৈল্‌জা = হৃৎপিণ্ড।

করট্‌ = পার্শ্ব।

চল্‌না, চন্না = কপালের পার্শ্ব।

সম্বন্ধবাচক শব্দ

ছাইলা ; ছালিয়া ; পুলা ; পুয়া ; পুত = ছেলে।

মুনি = মনুষ্য।

পরি ; কৈন্যা ; ঝেলা, ঝি ; মাইয়া = মেয়ে।

আবু = খোকা।

আবুদিয়া, আবুদ্যা = অবোধ শিশু।

দুদু = দিদি।

সাতাইমা বা হাতাইমা = সৎমা, বিমাতা।

সতি পুত, হতি পুত = সপত্নী পুত্র।

সতি ঝি = ঐ কন্যা।

পিআ = পিশা [পিশা> * পিহা> পিআ]

পী, পু = পিশী [পিশী> পিহী> পী]

মই, মসি = মাসী।

মৌআ = মেসো। তুলনায়—মাউসা (বরিশাল)

খুড়া = কাকা

পুতি = গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর বয়োজ্যেষ্ঠ ও পিতার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবাপন্ন ব্যক্তি।

দাদি = নিজের ভ্রাতৃভাবাপন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি।

দেওর = দেবর।

ভাউর = ভাসুর।

দেওরকর = দেবর পুত্র।

দেওর কৈন্যা = দেবর কন্যা।

ভাউরকর = ভাসুর পুত্র।

ভাউর কৈন্যা = ভাসুর কন্যা।

হৌর = শ্বশুর (শ্বশুর> *হহুর>হউর>হৌর)

হরী = শাশুড়ী (শাশুড়ী>* হাহুড়ী>হাউড়ী>হরী)

নাতি, নাত্তন = নাতী, নাত্নী।

মাউগ = স্ত্রী (গালি অর্থে।

মাউগা = স্ত্রীর বশীভূত ব্যক্তি।

ননরী = স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

ননন্দ্ (ননন্), নন্দ = স্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

জাল = জা।

কাচা পোয়াতি = নব প্রসূতি।

কাকু (আহ্লাদার্থে) = কাকা।

নয়া (নওয়া) বউ = নববধূ।

শালা (হালা) = শ্যালক।

শালী (হালী) = শ্যালিকা।

ভৈ (বৈ) নারী = সই।

ভৈন = ভগ্নী।

খুড়ন = খুড়ী (করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে)।

জেঠন = জেঠী।

সুয়ামী, হাই (= সাঁই) = স্বামী।

তিরী = স্ত্রী (প্রাচীন বাঙ্গালায়ও 'তিরী')।

ঘর বাড়ী

দলান = দালান।

বড় ঘর = বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী যে ঘরে বাস করেন ও যেখানে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি থাকে।

লাকারী ঘর, কাচারী ঘর = বৈঠকখানা।

ঠাকুর ঘর = দেবতার ঘর। তুলনীয়—গোঁসাই ঘর (বরিশাল)।

টঙ্গী ঘর, আটচালা = বাড়ীর বাহিরের বড় ঘর।

মাণ্ডব = শ্রীহট্টে সাধারণতঃ দুর্গা ও চণ্ডী পূজার ঘরকে মাণ্ডব ঘর বলে ; তুলনীয় মণ্ডপ (বরিশাল)।

রসই ঘর = পাকের ঘর।

একচালা ; দুচালা, দোচালা ; চৌচালা = ঘরবিশেষ।

চবুতারা (চবুতরা = চত্বর) রোয়াক

আলং, ছায়ালা, ছাপটা, মাড়োয়া (ফেঁচগঞ্জ) = উৎসবাদি উপলক্ষে ২।৪ দিনের কাজ চালাইবার জন্য অস্থায়ী ঘর। তুলনীয় ছাপরা (বরিশাল), ছাবরা, ছায়লা (ফরিদপুর-কোটালিপাড়া)।

গুয়াইল ঘর, গরুঘর = গোশালা।

গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম

চাল = চালা।

পালা = খুঁটি।

ছন = উলুখড়।

বাশ = বাঁশ।

রুআ = এক জাতীয় ছোট বাঁশ।

ইকর, বাতা = যাহা দ্বারা বেড়া দেওয়া হয়। তুলনীয়—আসামী ইকরা।

মাড়ইল = ঘরের চালের নীচে লম্বালম্বি যে বাঁশ থাকে।

তীর, ঠাউক্‌রা = ঘরের চালের নীচের বংশখণ্ড;

বাকা = বাঁকা বা তেরছা বংশখণ্ড।

কোঞ্চি = সরু বাঁশ।

ঢিকা = ঠেকা।

খাপ = বাঁখারি।

বর্‌গা = বরগা।

চটী = পাতলা বাঁখারি।

বেত = বেত্র।

খালি = বেত তৈয়ার করিবার উপযুক্ত বাঁশের টুক্‌রা।

পুতা (= পোতা) = ঘর তোলার পূর্ব্বে ঘর তৈয়ারের উপযোগী উচ্চ ভূমি।

ভিটা = যে ভূখণ্ডে বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়।

উসারা, উছ্‌রা; হাইত্‌না; ধাইর = বারান্দা।

পুলি = ঘরের কোঠা। (*আসামীতেও*)

উগার = ঘরের মধ্যে জিনিষ পত্র রাখিবার মাচা। তুলনীয়, উগৈর (কোটালিপাড়া) উঁথের, হাপার (বরিশাল)।

চাঙ্গী = বাঁশের চটী প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পুস্তকাদি রাখিবার মাচা।

চাঙ্গ = কাঠ প্রভৃতি রাখিবার মাচা।

থাক্‌ = জিনিষপত্র রাখিবার মৃত্তিকা কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি।

ছেইচ্‌, ছাইচ্‌ = বৃষ্টি হইলে যেখান দিয়া ঘরের চালের জল পড়ে।

পশ্চব = ছেইচ্‌ এবং বারান্দার মধ্যস্থান।

চান্দর, গঞ্জ = ঘরের প্রস্তের দিকের পার্শ্ব।

কানি, বাজু = কিনারা।

ঝাপ = একজাতীয় বেড়া।

বেড়্‌, বেড়া = বেড়া।

টাট্টি = এক জাতীয় বেড়া, ঝাঁপ। (কোন কোন স্থানে পায়খানা অর্থেও হিন্দুস্থানী 'টাট্টি' শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

রন্ধন বিষয় শব্দ ও গৃহস্থালীর তৈজসাদি

রসই (রসুই) ঘর = রান্নাঘর।

পাখাল, চুলা = উনুন। তুলনীয় আখা (ফরিদপুর-কোটালিপাড়া) আঁহাল (বরিশাল, < পাকশালা)।

পাতিল = মাটির হাঁড়ি।

তসলা = পিতলের হাঁড়ি।

ডেগ = পিতলের বড় হাঁড়ি।

কড়াই = কড়া।

হাতা = হাতা, দর্ব্বী।

বাউলি = বেড়ী (তুলনীয়—বাওলী, ফরিদপুর-কোটালিপাড়া)।

খন্তা = খুন্তি।

পিড়া = উনুনের উপরের মাটীর উচ্চ শৃঙ্গত্রয়।

লাকড়ি, খড়ি, দারু = জ্বালানী কাঠ (খরি, আসামী)

দেড়িয়া (দেরিয়া) হওয়া = হাঁড়ির একদিকে ভাত কম ও একদিকে বেশী সিদ্ধ হইলে 'ভাত দেড়িয়া হওয়া' বলে।

টানান = মাছ প্রভৃতিকে অল্প ভাজা করিয়া রাখা।

সাত্‌লান = তরকারির মধ্যে জল দেওয়ার পূর্ব্বে মশলা দিয়া নাড়িয়া একটু ভাজার মত করা।

সম্ভার দেওয়া = উত্তপ্ত তৈল কিম্বা ঘৃতে পাঁচফোড়ন লঙ্কা প্রভৃতি দিয়া ডাল প্রভৃতি ঢালিয়া দেওয়া।

পাটা = শিল।

পুতাইল = নোড়া (তুলনীয়—পুতা বরিশাল, ফরিদপুর-কোটালীপাড়া)।

ছিক্কা = শিকা।

পিড়ি, পিড়া = পিড়ি।

থাল = থালা।

গেলাস, গলাস, গল্লাস = গ্লাস।

কাচন = ছোট বাটী।

লুটা = ঘটী।

থাদা = পাথর বাটী।

পাথৈর, পাথুর = পাথরের থালা।

ঘুটনি = কাঁটা।

মালসা = পিতলের।

মটকি(কা), হাড়া = বড় মাটির হাঁড়ি।

পাতিল = ছোট হাঁড়ি।

ডালিয়া = মাটীর মাল্‌সা।

কাই = মাটীর পাত্রবিশেষ।

মুছি = খুরির আকারের পাত্র, প্রদীপরূপে ব্যবহৃত হয়।

ঘটি = ঘটী।

চাটা = প্রদীপ দেওয়ার।

কটরা, কট্টা = কৌটা।

গাছা, ঠনা = প্রদীপ রাখার জন্য কাষ্ঠ কিম্বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ পিলসুজ ; অন্যত্র—দেরখুয়া, দেউরখা।

টুকুরি ; আগুল ; উড়া ; উড়ি = ঝুড়ি ; তুলনীয় আগৈল (বরিশাল, ফরিদপুর)।

ধুচৈন, ধুচ নি = ধুচুনি।

চালৈন = চালুনি।

কুলা = কুল্য, কুলা।

খলৈ, ডুলা, কাকরাল = মাছ রাখার পাত্র।

পেটেরা, ঝাপি = পেটা।

পুরা = ধান মাপের পাত্র-বিশেষ।

সে (হে) র = ঐ ছোট।

চৈতা

হুরইন = ঝাঁটা।

খাদ্য দ্রব্য

আলা চাউল, আলুয়া = আতপ তণ্ডুল।

উনা = সিদ্ধ চাউল (<উষ্ণ)।

আম্বল = টক।

ডাইল = ডাল।

তরকারী, বেঞ্জন, বেঞ্জন = ব্যঞ্জন।

চরচরিয়া, চর্চ্চরা, তর্‌তর = ঝাল তরকারী।

আনাজ = অপক্ক তরকারী।

করুয়া, কউরা, করু শুক্‌না ঝাল।

শুক্তানি, শুকৎ = শুক্‌তানি।

হাও, হাগ = শাক।

খুদের (= খুদর) জাউ = খুদের তৈয়ারী ভাত। তুলনীয়—সাত হাড়ী মোহা বীর খায় খুদ জায়ু (কবিকঙ্কণ ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ)।

জাউ = শ্রীহট্ট সহর ও তন্নিকটস্থ স্থানে প্রাতর্ভোজন মাত্রকেই জাউ বলে।

পানিভাত = জলভাত

বাই ভাত, কর্‌করা ভাত = বাসিভাত।

লাব্‌ড়া = নিরামিষ ডালনা, ইহার প্রধান উপাদান লাউ।

রসর জাউ = আখের রস দিয়া প্রস্তুত অন্ন। মিষ্টান্ন।

পরমন্ন = মিষ্টান্ন।

পুলাও = পোলাও।

পিষ্টক-ভেদ—খুরি ; মাল্‌পা ; পাটী-হা (সা)প্‌টা ; চই পিঠা ; দুধ পুলি ; সিদ্ধ পুলি ; খোলা (খুলা) পিঠা ; উনা পিঠা (<উষ্ণ) ; পাইত্‌লা, ঝটী, তস্‌লা ; চুঙ্গা পিঠা = একজাতীয় বাঁশের সাহায্যে ইহা প্রস্তুত হয় ; কাছ্‌নি পিঠা।

লালিগুড় = একজাতীয় পাত্‌লা গুড়।

উকরা = গুড়মিশ্রিত চিড়া অথবা খই (মুড়্‌কি)।

পাগ দেওয়া = খৈ চিড়া প্রভৃতি উত্তপ্ত গুড়ে মাখান।

লাড়ু = মোআ।

সেওয়াই = ডাল ও গুড়দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

কালাইর সন্দেশ = কলাইর সন্দেশ।

তক্‌তি = নারিকেল দ্বারা তৈয়ারী মিষ্ট খাদ্য।

চিরা জিরা = নারিকেল দ্বারা তৈয়ারী চিড়া জিরা।

তরকারী ও ফল

আনাজ = তরকারী।

বাইঙ্গন, বাঙ্গইন (মুসলমান) = বেগুন।

পাতি লাউ = কদু (মুসলমান) = লাউ।

স(হ)পরি লাউ = মিষ্ট কুমড়া।

উদাইয়া = উচ্ছে।

করলা

ঝেঙ্গা = ঝিঙ্গা।

উরি = সিম।

ফান = মানকচু।

মুখি = কচুর মুখি, অঙ্কুর।

ডেঙ্গা, ডুগি = ডাঁটা।

হজা, খিরা = শশা।

কুশ্যাইর, কুশিয়াইর, কুশার = আঁক।

কয়ফল = পেঁপে।

ছিমায়

বাঙ্গী = ফুটি।

জামীর = কমলা।

লেম্বু = লেবু।

তেতই, আমলি = তেঁতুল।

চৈল্‌তা = চাল্‌তা (—অউ, আসামী)

আনানাস = আনারস

জাম্বুরা = বাতাবি লেবু। তুলনীয়, ছোলম (বরিশাল)

ডেফল

টকুরই, লুকুলুকিয়া।

কাঠল = কাঁঠাল।

কাউ = ফলবিশেষ।

ডেউয়া = ফলবিশেষ

করচ, করঞ্চা = ঐ

কামরেঙ্গা, কাপরেঙ্গা = ঐ

পিষ্টি, পিসষ্টি = ঐ

আমড়া = ফল ; তুচ্ছার্থেও ব্যবহার হয়।

ভুবি = ফল বিশেষ। (= লটকা, ফরিদপুর)।

স(হ)পরি = পেয়ারা।

বরই = কুল।

কলার প্রকারভেদ—

কলা,—

ডিঙ্গামাণিক

লম্বী = শাইল কলা।

চাম্পা কলা = চাঁপা কলা।

আগ্নি চাম্পা

জাজী কলা

ভূষা শা (= হা) ইল
ঐ লম্বী

গেরা কলা

পূজার জিনিষ

তামার টাট্।

রিকাব (রিকাবি)
টাটী
} পিতলের ছোট থালি।

ছিপ কুশা = কোষা কুষী।

ধূপতি = ধূপের পাত্র।

চাটা = প্রদীপ।

সইল্‌তা, হি(সি)জ = সলিতা।

নবিদ, নবিদ্দি, চাউল পসাদ = নৈবেদ্য।

ছেপায়া = তেপায়া (কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে), নৈবেদ্যের থালা রাখার ত্রিপদ-বিশিষ্ট গোল টুলবিশেষ।

নৌকা ও তাহার সরঞ্জাম

ছরমদান = সরঞ্জাম।

নাও = নৌকা।

চৈর, লগি।

বৈঠা।

দাড় ।

ম .মা) স্তুল

ডাণ্ডি = পালের দণ্ড ।

পাল ।

ডাণ্ডি দড়ি ।

হেওইৎ, হেওৎ = সেঁউতি ; "কাঠের সেঁউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ"—অন্নদামঙ্গল ।

উ(হু)ক্কা = হুঁকা ।

কল্কি = কল্কে ।

তামাউক, তামুক = তামাক ।

টিক্কা, টিকি = টিকিয়া ।

আলা৷, আলিয়া ।

তুষ ।

চুকল ।

লেম্‌টন = লণ্ঠন ।

চাটি = নল কিম্বা মুর্ত্তার তৈয়ারী ।

ছইয়া, ঘুম্‌টি = নৌকার উপরের আচ্ছাদন ।

কেওর = দরজা ।

ধাপর = পার্শ্বের আচ্ছাদন ।

নাওর তলি = নৌকার নিম্নদেশ । তুলনীয়, নাব্‌র তলি (আসামী)

ভাট্টোল, ভাইট্টল = পিছনের আচ্ছাদন ।

দাড়গনা = দাঁড়ের ত্রিকোণাকৃতি কাঠ ।

হরই = দাঁড়ের দড়ি ।

চরাট = নৌকার ভিতরের আচ্ছাদন । (উপুর চরাট, মুর চরাট) ।

মাচাইল = বাহিরের চরাট ।

গলই, ছেও ।

চণ্ডীপাট ।

বাতা ।

পাতাম = চেপ্‌টা লোহা ।

পেরাগ = পেরেক ।

গালা, নাওয়ের গালা ।

গুড়া ।

গেরাবি, নঙ্গর ।

গুণ = দড়ি ।

পাড়া = নৌকাবন্ধনের কাঠ কিম্বা বংশদণ্ড ।

বাইছা = নৌকা চালক । (আসামীতেও)

বাইছ = নৌকাদৌড় ।

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস*

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস নিজে একজন বড়লোক ও বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরাও বেশ বড লোক ছিলেন। তাঁহার বংশেও অনেক বড়লোক জন্মিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম আখণ্ডল বংশ। রাঢ়ীয় সমাজে আখণ্ডলেরা আদি বংশজ। বল্লালের সভায় যাঁহারা কুল পাইয়াছিলেন, আখণ্ডল তাঁহাদেরই একজনের প্রপৌত্র। ইনি কেন কুল হারাইয়াছিলেন, ঘটকেরা তাহা বলিতে পারেন। কুল হারাইয়া তাঁহাদের বিবাহ দিতে কষ্ট পাইতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার মান হারান নাই। বঙ্গদেশে একটা কথা চলিত আছে,—'বঙ্গে আখণ্ডলঃ পূজ্যঃ' ইহার কারণ, এই বংশে অনেক অসাধারণ ধনী ও অসাধারণ পণ্ডিতের উৎপত্তি হয়।

ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল—মধ্যমগ্রাম বা মাঝের গাঁ। লোকে সকালে এই গ্রামের নাম করে না; বলে,—করিলে সেই দিন আহার জুটে না। কারণ আখণ্ডলেরা অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন—অতিথিদের আদৌ সৎকার করিতেন না। অনেক সময় অতিথিরা দ্বিপ্রহরে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু সেই গ্রামে আখণ্ডল আর নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের দৌহিত্র-বংশে সেই গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে। আখণ্ডলদের আদিস্থান মাঝের গাঁ হইলেও ইঁহারা নবদ্বীপেই টোল করিতেন। কেহ পুরী, কেহ বা কাশীতেও বাস করিতেন। একঘর আখণ্ডল লোহাগড়াতে (যশোহর) সসম্মানে বাস করিতেছেন। নলডাঙ্গার রাজারা আখণ্ডল-বংশের লোক। তাঁহারা বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। লোকে বলে—'দানে কৃষ্ণনগর, মানে নলডাঙ্গা।'

রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রথম নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভাই। তিনি নিজেও খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং পঠন-পাঠন লইয়াই থাকিতেন। বাঙ্গালার সুলতানেরা ও সুবেদারেরা তাঁহার পায়ে নমস্কার করিতেন। তাহাতে তাঁহার পায়ের নখ মুকুটের হীরার রংএ রঞ্জিত হইয়া যাইত। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। ইনি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং নানাশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি কবিচন্দ্র নামে একজন কায়স্থকে বাড়ীতে রাখিতেন এবং তাঁহার দ্বারা পুরাণ পুথি নকল করাইয়া লইতেন। ১৫৮৮ সালে কবিচন্দ্র তাঁহার জন্য লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরুর এক অংশ নকল করেন। সে পুথিখানি এখন ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে আছে।

বিদ্যানিবাস এইরূপে অনেক পুথি নকল করাইয়াছিলেন। তাঁহার একটী বেশ ভাল লাইব্রেরী ছিল। তাই তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা অনেক বই লিখিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ চালান। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়—দেবগিরিতে—মহারাষ্ট্রদেশে। যখন হিন্দুস্থানে মুসলমান অধিকার হইয়া

* ১৩৩৭।১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে একেবারেই হয় নাই, সেই সময় বোপদেবের বাপ কেশব রাজার ছাউনিতে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। বোপদেব সেই ছাউনিতে বসিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুগ্ধবোধ লিখিলে চারিদিকে ঐ গ্রন্থের পসার হইয়া উঠে। এক সময়ে এমনও বোধ হইয়াছিল যে, মুগ্ধবোধই ভারত ছাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না; কারণ, ব্রাহ্মণদের ভিতর একটা সংস্কার আছে যে, যে বাড়ীর যে ব্যাকরণ সেই বাড়ীর সব ছেলেই সেই ব্যাকরণ পড়িবে। যদি না পড়ে তবে ব্যাকরণ-সরস্বতী কুপিত হন এবং তাহাদের ব্যাকরণে সংস্কার হয় না।

যখন সংস্কার এতই দৃঢ় তখন আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যাকরণগুলি সরাইয়া দিয়া নবদ্বীপের মত পণ্ডিতবহুল স্থানে, এমন কি, গঙ্গার দুই ধারেই, মুগ্ধবোধ চালান যে কি কঠিন কাজ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মুগ্ধবোধের যে সব টীকা প্রচলিত আছে, সকলেই বিদ্যানিবাসের টীকার দোহাই দেন। কেহ বলেন,—তিনি আদি টীকাকার; কেহ বলেন,—তিনি প্রাচীন টীকাকার; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহার টীকা পাই নাই।

এঁড়েদার ঘোষালদের আদিপুরুষ মুগ্ধবোধের টীকাকার রাম তর্কবাগীশ একজন বড় শাব্দিক ছিলেন। শব্দশাস্ত্রে তাঁহার অনেক বই আছে। একখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, অন্য অন্য গ্রন্থও আছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি মুগ্ধবোধের টীকা। তিনি এই টীকার গোড়ায় লিখিয়াছেন,—

পরেঽত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কালাপকোবিদাঃ।
একে বিদ্যানিবাসাঃ স্যুরন্যে সংক্ষিপ্তসারকাঃ॥

তিনি বিদ্যানিবাসকে পাণিনি, সর্ব্ববর্ম্মা ও ক্রমদীশ্বরের ন্যায় একটা মতপ্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে সমান আসন দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিবাসের এরূপ আসনপ্রাপ্তির একমাত্র অধিকার তাঁহার রচিত মুগ্ধবোধের টীকা। অন্য ব্যাকরণে এবং অন্য শাস্ত্রেও বিদ্যানিবাসের অধিকার ছিল। বিদ্যানিবাসেরই তুল্য কালে ভট্টোজি দীক্ষিত পাণিনির সূত্রগুলি বিষয়ানুসারে সাজাইয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে একখানি ব্যাকরণ লেখেন। উহার অর্থ এই যে, উহাতে কেবল সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া আছে। সে সিদ্ধান্ত কাহাদের? ব্রাহ্মণদের। পাণিনির যে সকল বৌদ্ধ টীকাকার ছিলেন, ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই; কেবল পাণিনি, কাত্যায়ন ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি ও কৈয়ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার পুস্তকের নাম হইয়াছে—সিদ্ধান্তকৌমুদী। ভট্টোজি নিজেই এই সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি টীকা লেখেন; তাহার নাম 'প্রৌঢ়মনোরমা'। ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদী ছাঁটিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিনখানি পুস্তক লেখেন। একখানির নাম 'লঘুকৌমুদী' আর একখানির নাম 'মধ্যকৌমুদী' আর একখানির নাম 'সারকৌমুদী'। ইহাদের মধ্যে একখানি নিতান্ত ছোট। যাহারা ব্যাকরণ আরম্ভ করিতেছে, তাহাদের জন্য একখানি; যাহাদের ব্যাকরণে কিছু দখল হইয়াছে তাহাদের জন্য আর একখানি।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর যে মনোরমা টীকা ছিল, রামচন্দ্র শর্ম্মা শিবানন্দ ভট্ট বা শিবানন্দ গোস্বামীর অনুরোধে তাহা হইতে বাছিয়া লইয়া এবং নিজের মত যোজনা করিয়া মধ্যকৌমুদীর এক টীকা লেখেন; তাহার নাম মধ্যমনোরমা এই বইখানি রামচন্দ্র বিদ্যানিবাসের নামে উৎসর্গ করেন। যে ভাবে উৎসর্গ করেন, তাহাতে বোধ হয়, বিদ্যানিবাস তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

কণ্ঠে বিদ্যানিবাসস্য স্থিতা মধ্যমনোরমা।
গোস্বামী শ্রীশিবানন্দো মুদং বিতনুতাং সদা॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস সে সময়ে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেনর কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। ১৮৭৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মধ্যমনোরমার বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন,—'Nothing can be said with certainty concerning the time and place of Ramachandra Sarma, the author, nor of Sivananda Bhatta or Gosain at whose request the work was written nor about Vidyanivasa, the tutor or spiritual guide of the author."

ভারতবর্ষের যেখানেই যাও দেখিবে নৈয়ায়িকেরা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারেন এবং নবদ্বীপের নাম করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদ্যানিবাসের নাম জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন বিদ্যানিবাস বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা। আর বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পড়িয়া থাকেন, মুখস্থ করেন এবং উহার মুক্তাবলী টীকা লইয়া বিচার করেন।

এইখানে বলিয়া রাখি, ভট্টোজি দীক্ষিতের প্রৌঢ়মনোরমাতেই অধিক পরিমাণে মুগ্ধবোধের মত খণ্ডন করা হইয়াছে এবং মুগ্ধবোধ যে পশ্চিম ও মধ্য ভারত হইতে তাড়িত হইয়াছে, তাহার কারণও এই মনোরমা। বিদ্যানিবাস যখন মুগ্ধবোধের পক্ষ হইয়া বাঙ্গালায় উহাকে আশ্রয় দিলেন, তখন ভট্টোজির তিনি বিরুদ্ধবাদী হইলেন। রামচন্দ্র শর্ম্মা বোধ হয়, এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সমন্বয় করিয়াছিলেন। তাই ভট্টোজির বইএর টীকা করিতে গিয়া বিদ্যানিবাসকে স্মরণ করিয়াছেন।

বিদ্যানিবাস যে সময়ে বাঙ্গালার প্রধান ভট্টাচার্য্য, সে সময়ে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। চৈতন্যদেবের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী মথুরা ও বৃন্দাবন উদ্ধার করেন। সন্ন্যাসীরা কুরুক্ষেত্র উদ্ধার করেন। এইরূপে এই সময়ে অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক তীর্থ উদ্ধার হয়। কাশীর উপর মাঝে মাঝে মুসলমান আক্রমণ হইলেও কাশী তীর্থটীর লোপ হয় নাই। কারণ প্রত্যেক শতাব্দীতেই আমরা দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে অনেকগুলি উড়িয়া পণ্ডিত রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কাশীবাস করেন। চতুর্দ্দশের শেষে বা পঞ্চদশের গোড়ায় কৃষ্ণ ভট্ট কাশীবাস করিয়াছিলেন। বিদ্যানিবাসের পিতামহ নরহরি বিশারদও কাশীবাস

করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও কাশী গিয়াছিলেন। তিনি বাস করিয়াছিলেন নীলাচলে অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে। তখনও জগন্নাথক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত পড়ে নাই। বাঙ্গালাদেশের —বিশেষ রাঢ়ের—প্রধান তীর্থই ছিল জগন্নাথ। সেইজন্য জগন্নাথতীর্থের যাত্রা ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক পুথি বাঙ্গালা দেশে লেখা হয়। এই সকল লেখকদের মধ্যে বিদ্যানিবাস একজন প্রধান। বার মাসে জগন্নাথের যে বার পর্ব্ব হইয়া থাকে, তিনি তাহার এক বিবরণ লিখিয়া যান। এই বার পর্ব্বকে দ্বাদশ যাত্রা বলে। এ দ্বাদশ যাত্রা ছাড়া তিনি আরও অন্যান্য যাত্রার কথাও লিখিয়া যান। যাত্রার বিবরণ লিখিতে অনেক কাঠখড়ের দরকার। প্রথম জ্যোতিষ জানা চাই। না হইলে যাত্রার সময় জানা যায় না। তারপর পুরাণ জানা চাই, নহিলে যাত্রার ফলাফল বুঝা যায় না। তাহার পর প্রতি যাত্রায় কিরূপ পূজাপাঠ করিতে হয়, কিরূপে ব্রত উপবাস করিতে হয়, কোন্ কোন্ ফুল দিতে হয়—এসকল জানা চাই। সুতরাং অনেক শাস্ত্রের বই দেখা না থাকিলে যাত্রার বই লেখা যায় না। বাঙ্গালীর যে প্রধান তীর্থ সে তীর্থে যাত্রা ও পূজা পদ্ধতির কথা লিখিয়া বিদ্যানিবাস রাঢ় ও গৌড়মণ্ডলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রঘুনন্দনের নামেও যাত্রার কতগুলি বই চলে, তবে উহা কে লিখিয়াছেন, বলা যায় না।

কাশীতে ছয় ঘর বড় বড় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আছেন। প্রায়ই তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—ভট্টবংশ, বিশ্বামিত্র গোত্র; আদি বাড়ী প্রতিষ্ঠানপুর, গোদাবরীর ধারে। রামকৃষ্ণ এই বংশের একজন পণ্ডিত। তিনি আসিয়া কাশীতে বাস করেন। ইনি আমাদের রঘুনাথ শিরোমণির একজন গুরু। ইঁহার পুত্র নারায়ণ ভট্ট প্রকাণ্ড পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ দুই দেশেরই স্মৃতির বই তিনি লিখিয়াছেন। অনেক তীর্থ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শঙ্কর ভট্ট একজন ব্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বংশের একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন; উহার নাম গার্গিবংশানুচরিত। রামেশ্বর, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গুণবর্ণনা করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তাহা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক পণ্ডিতের কথা তিনি বলিয়াছেন। দিল্লীতে এবং বোধ হয়, টোডরমলের বাড়ীতে দুইবার ভারতবর্ষের সব স্থানের পণ্ডিত লইয়া সভা হয়। শঙ্কর লিখিয়াছেন,—দুই সভায়ই ভট্টনারায়ণের জয় হয়। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্য মতমূর্জ্জিতত্বং নিনায়।" একবার সভা হয় — কে গ্রহণ দেখিতে পারে এবং কে পারে না, তাহা লইয়া। আর একবার হয়—জীবন্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, না কুশময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে—এই লইয়া। শঙ্কর বলিতেছেন,— এই দুই সভাতেই বাঙ্গালীর প্রধান পণ্ডিত বিদ্যানিবাস উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, এখনও দক্ষিণীরা জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করে অথচ আমরা দর্ভময় ব্রাহ্মণে করি। যদি বিদ্যানিবাস প্রভৃতি কয়েক জন বড় পণ্ডিত আমাদের মত সমর্থন না করিতেন, তাহা হইলে আমরাও বোধ হয়, এতদিনে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মত জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করিতাম। সুতরাং এই সকল স্থানে বিদ্যানিবাসই বাঙ্গালীদের রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র*

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে যখন একটা নূতন সাড়া পড়িল, বাঙ্গালার সেই নবজাগরণের দিনে সাহিত্য-প্রচেষ্টা যে কত বিচিত্রমুখী হইয়াছিল, তাহা যেমনি বিস্ময়ের ব্যাপার তেমনি কৌতুকাবহ। একদিকে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তার নব শিক্ষালব্ধ জ্ঞান নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশ ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক, অন্যদিকে শুদ্ধ সংস্কৃতনবীশ, শুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শিক্ষিত বাঙ্গালী, পুরাতন সংস্কারকে বর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক—তবু উভয়ের মনই নূতন প্রকার সাহিত্য-রচনায় উন্মুখ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্তটাই প্রায়,—বিশেষ করিয়া প্রথমার্দ্ধ,—এই দ্বিমুখী চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নূতন রাজধানী কলিকাতা ছিল এই সব নূতন নূতন প্রয়াসের কেন্দ্রস্থল;—বহু আলোচনা-সভা ও তর্ক-সমিতির কোলাহলে তখনকার কলিকাতার সমাজ মুখর; নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নিরন্তর নূতন ভাবে, নূতন প্রণালীতে নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ব্যস্ত; নূতন সমাজের ও সভ্যতার অগ্রদূত যাঁহারা, তাঁহারাও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বা অন্য কারণে কলিকাতাবাসী। আর রাজধানী হইতে দেশের অন্য সর্ব্বত্র এই নূতন প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবার কথা। তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে সুদূর রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনাতে শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহ কি ভাবে এই নবলব্ধ জ্ঞান ও নবসঞ্চারিত ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

শম্ভুচন্দ্রের কুলপরিচয় তাঁহার সভাসদ্ কোনও কবির রচনায় দেওয়া আছে।

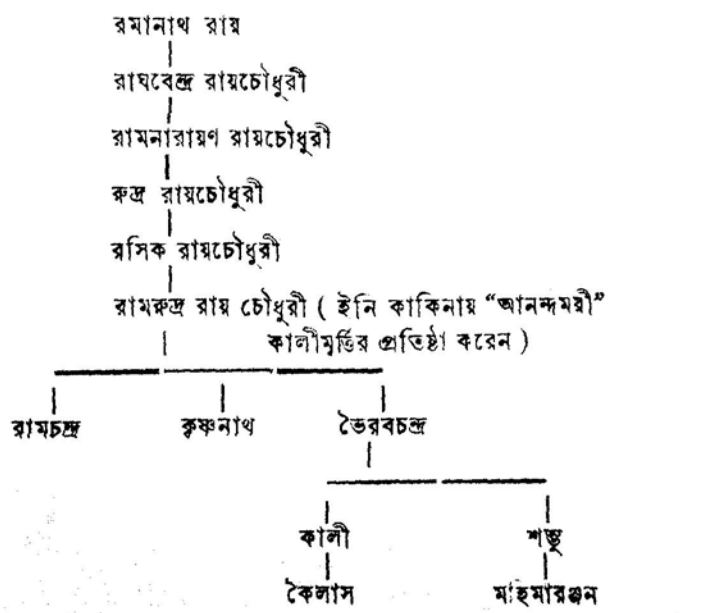

* ১৩৩৭।১৫ই তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শম্ভুচন্দ্র কিছুদিন বারাণসীক্ষেত্রে বাস করেন; সেখানে "আনন্দ সভা" স্থাপিত হয়। এই সভার জন্য তিনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৭এ ফাল্গুন, শনিবার, মদনপুরা হইতে "আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। পুস্তকটী কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 'আনন্দ' কথাটায় ও ইহার শেষভাগে সন্নিবিষ্ট 'তত্ত্বসঙ্গীতে' তত্ত্ববোধিনী সভার কিছু প্রভাব আছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু নির্ণয় হইবার উপায় নাই। কারণ, পৌরাণিক তত্ত্বের প্রতিও কবির বিলক্ষণ বৈরাগ্য দেখা যায় না। গ্রন্থখানি ১১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রথমে প্রার্থনা, তারপর "জ্ঞান হিতোপদেশ", তারপর শচীন্দ্র-কাব্য, তারপর বারাণসীর দেওয়ানী, আগরার তাজমহল, যমুনার নহর, রুড়কী ও হরিদ্বার,—এই সকলের বর্ণনা। তারপর আত্মপ্রসাদ, উর্দ্দু সায়র, সংস্কৃত কাশিকা, তত্ত্বসঙ্গীত। ক্রমে ক্রমে শম্ভুচন্দ্রের রচনারীতি, পাণ্ডিত্য ও দেশভ্রমণ-প্রীতির কথা বলিতেছি। একে ত চম্পূমাত্রই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত, সন্দেহ নাই, তাহাতে এই চম্পূর রচনা খানিকটা আলোচনা করিলে তাঁহার ভাষা কিরূপ সংস্কৃতের অনুগত ও সেই জন্য কৌতুকাবহ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদর্থে 'বিজ্ঞাপনের' (অর্থাৎ ভূমিকার) শেষ বাক্যটী উদ্ধৃত করা গেল,—

"এক্ষণে বিদ্যাবিনোদ বন্ধুবৃন্দের বিদিতে প্রার্থনা এই যে জঘন্য জ্ঞানে ঘৃণা না করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করতঃ গ্রন্থকারের শ্রম সফল করুন এবং ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কোন স্থানে যদি অবিহিত রচনাদি দোষ দৃষ্টি হয় তাহা স্বকৃত দোষের ন্যায় গোপন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শোধন করিয়া স্বীয় মহত্ত্বগুণ বিস্তারিত করুন।"

গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে অনুপ্রাসের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা রচনায় শম্ভুচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও রীতি যে কতদূর অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য প্রথম দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করা গেল, রসজ্ঞ পাঠক ইহার সহিত "কাদম্বরী"র তুলনা করিয়া দেখিবেন।—

"সভাজনসম্বোধন পুরস্সর কথিত হইতেছে যে পূর্ব্বস্মিন্ কালে চরাচর প্রবর নিকর অমরনগর সদৃশ ভূমণ্ডল স্থিত সর্ব্বজন সন্দোহ স্পৃহণীয় বিশ্রামপুত্র নাম নগরে পরম পবিত্র বিচিত্র চারুমনোহর হর্ম্ম্যবিনির্ম্মিত পুরে অপরিমিত স্পর্দ্ধা প্রবন্ধে চণ্ডচণ্ডাংশুতুল্য প্রবল প্রতাপান্বিত সভ্য ভব্য অভিনব্য হব্য কব্য কর্ত্তব্য বিশিষ্ট গরিষ্ঠ শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ মিষ্টভাষি গুণরাশি শিষ্টপক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্ট দুষ্টযুষ্টে অনিষ্টকষ্টপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্টকারিমন্ত্রীচ্ছাচারী স্বকীয়দারী নিত্যবিহারী নবদন্তধারী অমূল্যহারী দ্বাত্রিংশৎসচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগ্‌দর্শননামা মহারাজাধিরাজ চক্রচূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার একা মহিষী অতীব প্রেয়সী দীর্ঘকেশী সুচারুবেশী কুরঙ্গনেত্রা সুরঙ্গচেতা ভুজঙ্গহন্তা তুরঙ্গহাসা বিহঙ্গনাসা মাতঙ্গগামিনী নবাঙ্গ-ভঙ্গিনী শ্রীমতী হিরণ্যগর্ভা সাধ্বী সতী পতিপ্রতি রতিমতি বিবিধ ব্রতচারিণী।"

শম্ভুচন্দ্রের বাক্যযোজনার সহিত সংস্কৃত ভাষার এতদূর সৌসাদৃশ্য আছে যে, এই প্রসঙ্গে উক্ত 'জ্ঞানহিতোপদেশ''-অধ্যায় হইতে আর দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই বাহুল্যদোষ মার্জ্জনীয়।

"পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে নিতান্ত শাসনের খর্ব্বতা সর্ব্বতোভাবে ঘটিয়াছিল যে

শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয়ে মূলীভূত কারণ পিতামাতার ভদ্রাভদ্র ক্রিয়া প্রতি নিয়োগ বিয়োগ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুযোগ আবশ্যক সুতরাং তাহার বৈপরীত্যে সচ্চরিত্রের পবিত্রতার পদ্ধতি লুপ্ত হইয়া চঞ্চল চিত্তের স্বাধীনতার বিচিত্র চারুচংক্রমণে সংক্রমের উপক্রমব্যতিক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংক্রমের আক্রমণ সপরাক্রমে স্বভাব সংক্রম হইতে নিষ্ক্রম হইতে লাগিল।"

আবার—"অহমপি উপত্যকা হইতে সভারোহণরূপ উৎসেধ সমাশ্রয়ে উপস্থিতানুসন্ধানে চারুচক্ষুঃ চরণে সংক্রমণ করত সহৃল্লাসভাষে প্রকাশ করিতেছি যে ভূপতিরূপ এমন যে রত্নসানু ইহার শোভা দিন দিন পীন হইয়া দীন হীন প্রাণনে চিরদিন প্রবর্ত্তমান থাকুক।"

শম্ভুচন্দ্র পয়ার ছন্দই ভালবাসিতেন, ইহাই তিনি সাধারণতঃ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থাদৌ প্রার্থনা, তাহার মধ্যে খানিকটা দেহতত্ত্ব, রূপক ও আত্মপরিচয় —সংস্কৃত রচনারীতির প্রভাব সূচিত করিতেছে। অধুনা যে আদর্শ নিতান্ত পুরাতন হইয়াছে, তাহা যে তখনকার দিনে মানুষের মনে কিরূপ গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, তাহা প্রথম অংশ পাঠ করিবামাত্র হৃদয়ঙ্গম হয়। কবির আত্মপরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল,—

"জেলা রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুর ধাম।
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম॥
তথায় ভূম্যধিকারী রামরুদ্র রায়।
ছিলেন ধার্ম্মিক তিনি মহা তপস্যায়॥
তাঁহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার।
ঈশ্বর ভৈরবচন্দ্র ভৈরব প্রচার॥
শিবলোকে গেলা তিনি রাখি সুতদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয়॥
কনিষ্ঠ শ্রীশম্ভুচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক॥"

পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত অন্যান্য বহুছন্দে রচনা করাও শম্ভুচন্দ্রের অভ্যাস ছিল; "জ্ঞানহিতোপদেশ"-অধ্যায়েই আছে। বিভিন্ন ছন্দ অবলম্বনে "রসশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া" গুরু শিষ্যদিগকে হিতোপদেশ দিতেছেন,—

পয়ার :—ব্যসনে মূর্খের কাল অকারণ যায়।
বুদ্ধিমান রসশাস্ত্র আলাপে কাটায়॥
দীর্ঘ চতুষ্পদী :—জনকের নিবসতি গিয়া রাম রঘুপতি
হেলায় হরের ধনু বিভঞ্জন করিয়া।
করিলেন উপযম অনুপাম রূপঠাম
জানকী কনকলতা করে কর ধরিয়া॥
কুসুম-মালিকা :—কহে রেণুকা তনয় কহে রেণুকা তনয়।
আর বাহুজ বালক মনে বাস নাহি ভয়॥

ভুজঙ্গ-প্রয়াত :—ভ্রুভঙ্গে মহারোষ কোপ প্রকাশা।
শ্রুতিদ্বন্দ্ব নিষ্পন্দ ঝঙ্কার নাশা॥
নবাম্বু প্রবাহে যথা চঞ্চলালি।
তথা লোচনদ্বন্দ্ব লালী বিশালী॥

এইরূপ ভঙ্গত্রিপদী, ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ত-তিলক, তরঙ্গাবলি, ত্রিপদী, ভঙ্গ-পয়ার—নানা ছন্দে শম্ভুচন্দ্র কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়াছেন।

"জ্ঞান হিতোপদেশে"র পর শচীন্দ্রকাব্য। ইহাতে সংস্কৃত রীতির অনুযায়ী আদিরস যথেষ্ট পরিমাণে আছে, আর ইন্দ্রের পরস্ত্রী-বশ্যতা তো সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির বহুশঃ অনুমোদিত। আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তাই ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পরের কয়েকটী রচনায় একটু নূতন সুরের আমেজ আসিয়াছে,—সেগুলি খণ্ডশঃ দেব-বর্ণনা। আগ্রা, কাণপুর, কাশী, যমুনার নহর, রুড়্‌কী ও হরিদ্বার—এই সব স্থানের বর্ণনা। "বারাণসীর দেওয়ালী"—গদ্যে লেখা। আগরার তাজমহাল-রৌজা, প্রথমে তাজমহালের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, খাড়াই-চওড়াই ইত্যাদির মাপ। একটা সহজ কৌতুকানন্দ বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে উঁকি মারিতেছে; কিন্তু এই নিতান্ত গদ্যময় বর্ণনার শেষভাগ আবার গম্ভীর ও রূপকাশ্রয়,—

এই সূত্রে বোধ কর অর্ব্বাচীন জন।
শরীরে চৈতন্য বস্তু আছেন তেমন॥
আনন্দ সভার জয় আনন্দ কৃপায়।
আনন্দ কোষের বস্তু আনন্দ দেখায়॥
আনন্দ সভার ভৃত্য নিত্যানন্দে মজি।
আনন্দেশ্বরেতে মত্ত তেজ তত্ত্ব ভজি॥
ইতি তাজমহল রৌজাদর্শনানন্দরস পরিপাক সমাপ্তশ্চেতি।

ষোল অক্ষরের পয়ার আবার—একটু নূতন রকমের ছন্দ, কিন্তু ছন্দ মাত্রই, রস কিছুমাত্র নাই। যথা,—

আসার নিবৃত্তি নাই, চক্ষুরাদি কাহারোই।
বারেক দেখিলে শান্ত তৃষ্ণা পুন তাহারই॥
এ যাত্রা বাসনা খর্ব্ব সুতরাং গেল করা।
ধন্যবাদ দেই সেই যার সৃষ্টি হাতে ধরা॥

চম্পূখানিতে ইহা ছাড়া দুই পাঠ আত্মপ্রসাদ, দুই পাঠ উর্দ্দূ সায়র, দুই পাঠ সংস্কৃত কাশিকা আছে। তখনকার দিনে উর্দ্দূ বা ফারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত—তিনটী ভাষার তিন ধারা যে কেমন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মধ্যে খেলা করিত ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইত, তাহার বিচিত্র নিদর্শন শম্ভুচন্দ্রের রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন, তাঁহার উর্দ্দূ ছন্দ অবলম্বনে বাঙ্গালা কবিতা। ছন্দ,—

ও জন জলেখা

ফায়লাতুন ফায়লাতুন্ ফায়লা
মফউলন্ মফউলন্ মফউলন্
"বিমোহে ভুলিয়া ভূমা তোমারে।
ক্ষমস্ব সে গুণাদোষং আমারে॥"

কাশিকাদ্বয় হইতে বসন্ত ও শরৎকালের বর্ণনা পাই, শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষায় নৈপুণ্যের নিদর্শন হিসাবে দুইটী শ্লোক বাছিয়া পাঠকসমাজে উপহার দেই,—

বসন্তে— তুরগরথনিষণ্ণা ফীঙ্গবালা সুচেলা
চিকুররচনশিল্পৈ স্তত্র নানাত্ববেণী।
মৃদুমৃদুবদযুক্তা দক্ষিণন্তং স্বকান্তং
ঋতুপশুভহসন্তে কাশিকা কং ন মোহা॥

শরৎকালে— জবাবন্তী জাতী টগর করবীরারনি মণিঃ
সমুৎফুল্লৎফুল্লং চরণগতচেতোজনগণং।
পথে রথ্যা ঘোরা কিল জবনবার্ত্তামুপদিশন্
নভদ্বারে দ্বারে সরদি শুভকাশী বিলসতি॥

শেষের পংক্তি প্রতিবার বহুলীকৃত হইয়াছে, ইংরাজী refrain-এর মত।

শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপর সহসা একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার ভার দিলে ও দেশে বিশুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তর চর্চ্চা না থাকিলে যেরূপ রচনা আশা করিতে পারা যায়, আধুনিক সমালোচক শম্ভুচন্দ্রের রচনায় সেইরূপ দোষগুণ অল্পবিস্তর দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধ্বনির প্রভাব অতীতে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই; অথবা আমাদের জীবনে ছন্দের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে, কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনাও নীরস হইয়া পড়িতেছে।

একমাত্র রসসৃষ্টিই শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার মনে দেশের নানারূপ সংস্কার প্রবর্ত্তনের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, এবং দেশের শিল্পোন্নতি কি ভাবে হইতে পারে, ধর্ম্মবিষয়ে একটা জীবন্ত আগ্রহের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে, বাঙ্গালা অক্ষরে সকল ধ্বনির প্রতিরূপ কি উপায়ে পাওয়া যায়,—এইরূপ বহুবিষয়ে তিনি মন দিয়াছিলেন। শ্রমশিল্পের উন্নতির প্রতি তাঁহার যে সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল, "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পূ"-তে রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভার প্রতি তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। স্ব-রচিত দশটী গান গ্রন্থশেষে দেওয়া আছে, সবগুলি তত্ত্বমূলক, রসবেগে চঞ্চল নয়, সুতরাং তাহাদের আলোচনায় আমাদের উপকার নাই। শেষের গানটী তবু সহজ,—

বড় আনন্দের বিষয়।
এ আনন্দ কাননে উদয়॥

আনন্দ কানন একে সদা সদানন্দ ঠেকে
তায় আনন্দ সভা দেখে কে আনন্দ নয় ॥
যত সভ্য সভাপতি সর্ব্বদা নির্ম্মলমতি
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যতি সঙ্গে সদা রয় ॥

শম্ভুচন্দ্রের ভাষাসংস্কারের চেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কার্য্যানুরোধে বহু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার বাহিরে থাকিতে হয়, ফারসি ও উর্দ্দ শিখিতেও হয়, কিন্তু ফারসি হরপে লেখা উর্দ্দু জোবান অভ্যাস করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। "পারসি আরবি শব্দে যে যে স্থানে জ্জিম খে শে জ আয়েন গায়েন ফে কাপ—এহি সপ্তাক্ষর তাদৃশ কখনই হয় না, বরং অশুদ্ধ উচ্চারণে উর্দ্দ অভ্যাস করিয়া আলাপ করিতে গেলে, বিদ্রূপ ব্যঙ্গই লাভ হয়।" সুতরাং আকবর বাদসাহের সময় যে ভাবে সংস্কার হইয়াছিল, সেইভাবে কাজ করা উচিত। শম্ভুচন্দ্রের ভাষায়ই তাঁহার বক্তব্য বলি।—

"পারসীতে বাঙ্গালা বর্ণ বর্গের প্রায়শ দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অন্যান্য বর্ণই অভাব অর্থাৎ প্রথমত ট প চ ড ড় দ্বিতীয়তঃ ভ থ ফ ঠ ঝ ছ ধ ঢ ঢ় খ ঘ সমুদয়ে ষোড়শ বর্ণই ছিল না, তখন কতিপয় পারসীক বিদ্বান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া উক্ত কয়েক অক্ষর আপনাদিগের পারসী অক্ষরে গঠিয়া লইলেন প্রথমতঃ তের উপর চারি নোক্তাতে ট ও বের নীচে তিন নোক্তাতে প ও জ্জিমের নীচে তিন নোক্তাতে চ এবং দালের উপর চারি নোক্তাতে ড ও রের উপরে তো অক্ষরে ড় দ্বিতীয়তঃ বে হে ভ। তে হে থ। পে হে ফ। টে হে ঠ। জ্জিম হে ঝ। চে হে ছ। দাল হে ধ। ডাল হে ঢ। ড়ে হে ঢ়। কাফ হে খ। গাফ হে ঘ। ইত্যাদি। পারসীক বিদ্বানেরা যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দেশী ঠে ট প্রভৃতি লিখার সুবিধা করিয়া লইলেন কিন্তু হিন্দুস্থানীরা পারসী ও আরবী শব্দসকল শুদ্ধরূপ লিখাপড়া করার নিমিত্ত বাঙ্গলা অক্ষরের রূপান্তর অথবা কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া উচ্চারণের কিছুই সুবিধা করিলেন না। সুতরাং উক্ত অক্ষরে বঙ্গীয় সাধুভাষা ভিন্ন অন্যভাষা শুদ্ধরূপ লিখনের রীতি ও ব্যবহারও নাই শ্বেতকান্তি পুরুষেরা যাঁহারা সমুদয় বিদ্যাতেই দৃষ্টি সমান রাখেন তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বিদ্যার সহিত পারসী, আরবী বিদ্যার বিশেষরূপ সমন্বয় বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন; কিন্তু স্বজাতীয় ইংলিশ অক্ষরের দ্বারা উর্দ্দ ও বাঙ্গলা শুদ্ধরূপ লিখার অক্ষর গঠনের বিধিস্বরূপ রোমেন ক্যারেক্‌ট নামে বিলক্ষণ এক বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অনেক ইংলিশমাত্রবেত্তার যথেষ্ট উপকার দর্শিতেছে এ অবস্থায় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে পারসী আরবী অক্ষরের সহিত বাঙ্গলা অক্ষরকে কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ঐক্য করতঃ বাঙ্গলা অক্ষরে উর্দ্দ পারসী লিখার কোন এক সঙ্কেত যদি করা যায় তাহা হইলে সাধারণের উপকার হইতে পারে কি না।"

শম্ভুচন্দ্রের "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পূ" হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তদানীন্তন বিদ্যানুরাগীর মনের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সমাজের আদর্শ কি ভাবে কাজ করিয়াছিল; সাহিত্যের পুরাতন আদর্শ ও পুরাতন রচনানীতির আকর্ষণ তখনও বেশ প্রবল ছিল, আর অন্যদিকে নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করার লোভও দুর্নিবার। তাই একদিকে যেমন চম্পূ

লেখা হইত এবং সে চম্পূতে বিষ্ণুশর্ম্মা-হিতোপদেশের প্রতিচ্ছায়া পড়িত, অন্যদিকে আবার তেমনই স্থানবিশেষের বর্ণনা, নূতন করিয়া অক্ষর গড়িয়া ভাষার পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয় দেখা যাইতেছে ;—জ্ঞানের স্বল্পতা তাঁহাকে পীড়া দিত না, তাঁহাকে সাহিত্য রচনা হইতে বিরত করিত না।

শম্ভুচন্দ্র-সম্পর্কিত আর একটী বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহার সভায় কোনও এক পণ্ডিত পারস্য উপন্যাস সংস্কৃতে অনুবাদ করেন ; এই অনূদিত কাব্যের নাম "ফথলাজাখ্যং কাব্যম্"—এই অভিনব গ্রন্থের সামান্য পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। ফথলাজ-কাব্যের প্রথম খণ্ড (অন্যান্য খণ্ড আমি দেখি নাই) পঁচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ; গ্রন্থরচনার ইতিহাস গ্রন্থশেষে বিজ্ঞাপন-ভাগে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিবিধসদ্‌গুণ নিকেতন কাকিনীয়াধিপতি শম্ভুচন্দ্ররায় চতুর্ধুরীয়ঃ স্বয়মেকদা স্বসমজ্যায়াং মামাহূয় সংস্কৃতগদ্যপদ্যৈঃ পারস্যোপন্যাসং রচয়িতুমাদিশৎ প্রযত্নেন। তন্নিদেশস্যালঙ্ঘ্যতয়া স্বস্মিন্ কবিত্ববিত্তাদ্যসদ্‌ভাবেঽপি নির্লজ্জতামঙ্গীকৃত্য যথাশক্তি বর্ণনং করবাণীতি প্রতিজ্ঞায় মদীয় সস্নেহ-সম্মানাস্পদ শ্রীমদ্‌গোবিন্দমোহন রায় সদাশয়েনাধ্যবসায়িতঃ এতস্মিন্ প্রবন্ধরচনাকর্ম্মণ্যহং প্রবর্ত্তিতঃ। কতিপয়বাসরানন্তরম্ প্রোক্তসোৎসাহনিদেশকর্ত্তু র্জীবিতকালেন সমমেব গ্রন্থরচনাঽপ্যবসিতাভূৎ। সম্প্রতি তত্তনয়-সদ্বিদ্যানুরাগি-সদাশয়-শ্রীমন্মহিমারঞ্জনরায়েণ প্রযত্নতো মুদ্রণং কারয়িত্বৈতৎ পুস্তকম্প্রকটীকৃতম্। অস্মিন্ ভ্রম-প্রমাদিভি র্বহবো দোষা সংজাতা এব। তদাদ্যন্তং কৃপয়া সংশোধ্য গুণিগণাঃ পঠন্ত্বিত্যে-বার্থয়েঽহং। "গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে" অলমতি বিস্তরেণ। রচয়িতা

শাকে চন্দ্রনবাব্জীন্দু প্রমিতে কাকিনাপুরে।
কেনচিন্মুদ্রিতঞ্চৈতৎ পুস্তকং শম্ভুচন্দ্রতঃ॥

পারস্য রাজকন্যার নামে গ্রন্থের নাম। প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পর কাকিনীয়াধিপতির বংশাবলী ও সভার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। শম্ভুচন্দ্র যে একটা পণ্ডিত-সভা গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন, স্মৃত্যাদিশাস্ত্রবিৎ গুরুদাস শিরোমণি, জ্যোতির্ব্যাকরণাদি বিবিধশাস্ত্রপ্রবীণ কালীচন্দ্র চূড়ামণি, কাব্যব্যাকরণবিচক্ষণ বিশ্বেন্দ্র-ন্যায়রত্ন, বিবিধশাস্ত্রদর্শী শ্রীকান্ত বাচস্পতি, কাব্যাদিবিশারদ শ্রীশ্বর বিদ্যাভূষণ—ইঁহারা ছিলেন তাঁর সভাপণ্ডিত। সকলদর্শী লেখক, অমাত্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সেখ মছরফ প্রমুখ সর্দ্দার, শ্রীমোছাবুদ্দিন জেল্‌দকার ও সেখ বাহালি জমাদার পর্য্যন্ত সকলেরই নাম করিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দবাগ, মোহনবাগ, সুললিতবাগ, আনন্দবাগ, কালীবাগ, লোচনবাগ, বর্দ্ধনবাগ, বেগমবাগ, সুমানেবাগ, কাঞ্চনবাগ—ইত্যাদি উপবন ও তাঁহার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে যে সভার উৎসাহে ও অনুমোদনে পারস্য-উপন্যাস পর্য্যন্ত সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহার সম্বন্ধে আশা করি, বলিবার আর কিছু নাই, উপাখ্যানভাগ তো সকলেরই জ্ঞাতপূর্ব্ব। শুধু কাব্যের পাদটীকায় রচয়িতার লেখা কয়েকটী ব্যুৎপত্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে চাই।

(১) হারুনল রসীদ ইতি। দময়ন্তীবিচ্ছেদজনিতবিষাদেন হা ইতি রৌতি শব্দং করোতীতি হারুঃ। হারুশ্চাসৌ নলশ্চেতি হারুনলঃ হারুনলস্য রসো গুণোস্যাস্তীতি হারুনলরসী ঈদঃ শ্রীদঃ ইতি হারুনলরসীদঃ।

(২) বগদাদ ইতি। বস্য বলবজ্জনস্য গদা ইতি বগদা বগদাং দদাতীতি বগদাদঃ॥ বঃ বলবান্ ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দরত্নাবলী॥

(৩) জাফর ইতি। জেন জেত্রা জয়কর্ত্রা অফরঃ ন ফরং যস্য স জাফরঃ। জঃ জেতা ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দরত্নাবলী। ফরং ফলং ইতি তদ্ধ্বতামরটীকায়াং ভরতঃ॥

(৪) দামাশ নগর ইতি দামনি আশা যস্য স দামাশো নগরঃ॥

(৫) আবাল কসম ইতি উদারতাদিভি রাবালস্য সমঃ তুল্যঃ ইতি আবালকসমঃ॥

শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে জগদ্বন্ধু নামে জনৈক লেখক আরব্য-রজনী "আরব্য যামিনী" নাম দিয়া সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন ; ১২৯৯ বঙ্গাব্দের লিখিত ইহার এক পুথি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপরোদ্ধৃত শব্দব্যুৎপত্তি হইতে তখনকার সমাজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। শম্ভুচন্দ্র নিজের চারিদিকে একটা সাহিত্যের, শিক্ষার, বিদ্যার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহের আয়োজন সুবিদিত ছিল ; দুঃখের কথা, আজকাল তাহা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার পুস্তকাগার দেখিতে যাই, তখন শুনিলাম, তাঁহার গ্রন্থগৃহ সর্পবহুল এবং দিবালোকে দীপ জ্বালিয়া সাত আটজন লোক লইয়া অতি সতর্কতার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে—নতুবা বিপদের সম্ভাবনা আছে। মনে করি, তাঁহার সেই অযত্ন রক্ষিত পুস্তক-সংগ্রহ দেখিয়া লাভবান্ হইয়াছি। তখনকার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-ভাষায় রচিত বহু পুস্তক ও পুথি হেলায় পড়িয়া আছে,—যাঁহাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহারা অর্থের অনটনেই হউক আর অন্য যে কারণেই হউক, এবিষয়ে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তথাপি বিচিত্র বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে ও নবোদ্বুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের আত্মপ্রকাশচেষ্টায় সমাজে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, শম্ভুচন্দ্রের নিজের ও সভাসদের রচনার মধ্যে সে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন আছে মনে করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলাম।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৩৭।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ঝাঁপান্ *

"ঝাঁপান্" মেদিনীপুরের একটি পর্ব্বের নাম, বিষহরী মনসাদেবীর পূজা ও তাহার সঙ্গে সাপ লইয়া যে খেলা ও উৎসব তাহাকে চলিত কথায় "ঝাঁপান্" বলা হয়।

আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই উৎসবটি পালিত হয়। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মেদিনীপুর সহরে এই পর্ব্বটি খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। যাহারা এই পর্ব্বটি করে তাহাদিগকে গুণিন্ বা গুণী বলা হয়।

যাহারা ডাইনীর হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে, যাহারা মন্ত্রের শক্তিতে সর্পদংশন হইতে মানুষকে বাঁচাইতে পারে, বা যাহারা তুকতাক্ প্রভৃতির দ্বারা নানারূপ অলৌকিক ও অদ্ভুত ক্রিয়া সকল করিতে পারে, তাহাদিগকেই গ্রাম্যলোকে গুণিন্ বলে।

ঝাঁপাইয়া পড়া বা ঝাঁপান কথা হইতে এই ঝাঁপান্ কথার উৎপত্তি কিনা বোঝা যায় না। বিষাক্ত হিংস্র সর্পের সহিত অবাধে খেলা করার যে বিপদ্, তাহার মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে বলিয়া এই নাম হইয়াছে কি না, অথবা ঝাঁপানের দিন পূজার সময় কাহারও উপর যে 'ভর' বা 'আবেশ' হয়, যাহাকে তাহারা গ্রাম্য কথায় 'ঝুপার' বলে, তাহা হইতে এই ঝাঁপান্ কথার উৎপত্তি কিনা, বোঝা কঠিন।

মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থানই সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান। বিশেষতঃ ইহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ অসমতল ও জঙ্গলে আবৃত থাকায় নানারূপ সর্পের আবাস ভূমি। অতীতকালে ঐসকল স্থানে অসভ্য জাতিগণের বাস ছিল। এখনও যে জায়গায় জায়গায় ইহাদের বাস নাই, এমনও নহে।

যাহারা সর্পকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত বা এখনও করিয়া থাকে তাহারাই এই পর্ব্বের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ঝাঁপানের একটি গীতের কিয়দংশ হইতে এই কথা যে সত্য, তাহা মনে হয়। গীতটি এই,—

মাকে আন্‌তে যাব রে শিলাই নদীর কুল।
মায়ের পায়ে দিব রাঙা জবা, হাতে দিব ফুল॥

এই শিলাই বা শিলাবতী নদী মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মানভূম জেলায় উৎপন্ন হইয়া মেদিনীপুর জেলার উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই জেলার পূর্ব্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত ঘাটালের নীচে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে যত দূর জানা যায়, এই শিলাবতী নদীর তীরেই পূজার অধিক চলন।

পূজার দিন বা তার পরদিন প্রতিমার সম্মুখে নানা রকম খেলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহার নাম 'তুড়মি' খেলা। ইহার আবার প্রতিযোগিতা আছে। এক একজন গুণিন্ তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ও শিষ্যবর্গের সহিত একত্র হইয়া এক জায়গায় উপস্থিত হয়। গোরুর

* ১৩৩৭ সালের ৯ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার ১৮শ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

গাড়ীর চাকাগুলিকে উপরি-উপরি সাজাইয়া তাহার উপরে এক-একজন গুণিন্ নানা রকমওয়ারী সাপ দিয়া শরীরের অলঙ্কার করে; ঐ গাড়ীর চাকা-সকলের উপর গুণিন উঠিয়া বসে ও কুৎসিত ভাষায় সকলকে গালাগালি করে এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়া আক্রমণ করিতে আবাহন করে।

উচ্চ জায়গায় বসিবার উদ্দেশ্য এই যে, শূন্যের উপর সর্প দংশন হইলে বা লোককে সাপে কাটিলে আর উদ্ধার নাই। তখন তাহার দলের সকলে লাউয়ের তৈয়ারী এক রকম বাঁশী যাহার নাম 'তুড়মি', সেইটি বাজাইতে থাকে। এই 'তুড়মি' বাঁশী বাজাইয়া খেলা হয় বলিয়া ইহার নাম 'তুড়মি' খেলা।

একটি বাঁশ প্রোথিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে চাবুক মারে আর যাহাকে উদ্দেশ করিয়া চাবুক মারা হয় তাহার পৃষ্ঠে নাকি বাস্তবিক সত্য সত্য দাগ পড়ে ও রক্ত বাহির হইতে থাকে। কিন্তু তাহার বিপক্ষ পক্ষের যদি মন্ত্রের শক্তি অধিক হয়, সে প্রতিরোধ করিতে পারে; অবশ্য মন্ত্রের সাহায্যে। ইহাতে অন্য পক্ষ যতই চেষ্টা করুক প্রতিপক্ষের কিছুই অনিষ্ট হইবে না।

নানা রকমের 'বাণপড়া' আছে। একমুষ্টি মুড়কিকে মন্ত্রপূত করিয়া গুণিন্ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করে, আর ঐ মুড়কিগুলি বোলতা হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। 'রক্তবাণ' আছে, যাহার দ্বারা মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে; এবং 'বালিবাণ' দ্বারা গা ঝাড়িলে কেবল বালি বাহির হইতে থাকে।

তিনটি গোল চাকার মত দাগ কাটিয়া তাহার মধ্যে পর পর বাতাসা, কাগজি নেবু ও আধলা পয়সা রাখিবে। আর অন্যান্য সকলকে ঐ গুলি তুলিয়া লইতে বলিবে। যে লইতে যাইবে সে কিছুতেই ঐ দাগের কাছে অগ্রসর হইতে পারিবে না। পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিবে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকিবে। তবে যদি সে তাহার আক্রমণকারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তবে তাহার বিপক্ষ ঐ সকল জিনিসের মধ্য হইতে যাহা তুলিয়া আনিতে বলিবে, সে তাহাই অবলীলাক্রমে তুলিয়া আনিতে পারিবে।

যাহারা 'তুড়মি' বাজাইতেছে, বাজাইতে বাজাইতে ঐ 'তুড়মি' বাঁশী তাহাদের মুখ হইতে আর বাহির হইবে না; যতই টানাটানি করুক্, বরং বাঁশীটি আরও মুখের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে।

আরও শোনা যায়, একটি শালুক ফুলের ডাঁটার ছাল যে লোকের নাম করিয়া, মন্ত্র পড়িয়া ছাড়াইবে, সেই লোকের গায়ের চামড়াও নাকি সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া আসিতে থাকিবে।

ঝাঁপানের দিন মনসা দেবীর পূজা না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে উপবাস করিয়া থাকে। এই ব্রতধারীদের মধ্যে সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও 'ঝুপার' হয়। 'ঝুপার' হইলে সে মাটিতে হাত চাপড়াইতে থাকে ও মাথা চালিতে থাকে। যথার্থই তাহার 'ঝুপার' হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার মুখের সম্মুখে ধূনার 'ভাপরা' অর্থাৎ একটি হাঁড়িতে প্রজ্বলিত অগ্নি করিয়া তাহাতে অনবরত ধূনার গুঁড়া দেওয়া হয়। সমস্ত ধূম তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করিতে থাকে; তথাপি সে অবিচলিতই থাকে।

তারপর বাবুই বা জুন দড়িকে চাবুকের মত করিয়া পাকাইয়া তাহার পৃষ্ঠে মারিতে থাকে। তাহাও যদি সে নীরবে সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে সকলের বিশ্বাস হয় যে যথার্থ-ই তাহার উপর দেবীর 'ভর' হইয়াছে। তখন তাহাকে দেবীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, ও ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করা হয়, বা দুঃসাধ্য রোগসমূহ সম্বন্ধে ঔষধ জিজ্ঞাসা করা হয়।

পূজার দিন নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণীতে ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া ঘট ডুবাইতে যাওয়া হয়, কোথাও বা একজন গুণিন্‌কে সাপের অলঙ্কার পরাইয়া চতুর্দ্দোলে চড়ান হয়। মেদিনীপুর সহরে গুণিন্‌রা হাঁটিয়া যায়, গলায় ও বাহুতে বড় বড় বিষাক্ত সাপগুলি জড়ান থাকে। রাস্তার লোকে মজা দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে জুতা ও ঝাঁটার মালা গাঁথিয়া রাস্তার উপরে টাঙ্গাইয়া দেয়। এরূপ করিবার অর্থ, জুতার নীচ দিয়া ঠাকুরের ঘট লইয়া যাওয়া চলে না,—কাজেই সেই মালার দড়িটি মন্ত্রবলে কাটিতে হইবে। এরূপ দড়ি কাটিতে আমরা কখনও দেখি নাই। গুণিন্‌রা বলে তাহাদের এরূপ করিবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু পুলিশের ভয়ে তাহারা এই ক্ষমতার ব্যবহার করে না। কেন না, ফাঁসীর আসামীদিগকে ফাঁসীর দড়ি মন্ত্রবলে কাটিয়া দিয়া তাহারা বাঁচাইতে পারে, এই আশঙ্কায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। যে ঘটটি আনা হয়, তাহার একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘটের নিম্নে শত শত ছিদ্র থাকে কিন্তু ঘট ডুবাইবার সময় বা লইয়া যাইবার সময় যেন জল না পড়ে। ঐ কলসীটির মুখে একটি কলা-মোচার ছুঁচালো মুখ ঊর্দ্ধমুখে বসান থাকে। বাঁশের কুঁচি সরু করিয়া কাটিয়া তাহাতে জবা ফুল গাঁথিয়া মোচাতে ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া সাজাইয়া দেওয়া থাকে। কলসীটি একটি ত্রিশূলের উপর বসান হয়। একজন গুণিন্ ঐ ত্রিশূলটি বহিয়া লইয়া যাইতে থাকে।

নদীর ধারে ঘট ডুবাইবার সময়ও নানারূপ 'গুণ' বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হয়। যে গুণিন্ ঘট ডুবাইবার সময় ঘট মাথায় করিয়া ডুবিবে, তাহার এমন নাকি মন্ত্র আছে যাহার দ্বারা তাহাকে আর জলের উপর উঠিতে দিবে না। বাঁশের ছিদ্রময় চালুনীতে জল ভর্ত্তি করিয়া তুলিতে হইবে, যেন জল ছিদ্র দিয়া না গলিয়া পড়ে। আরও নানা রকম খেলা দেখান হয় সেগুলি আর বাহুল্যভয়ে লেখা হইল না।

ঘট ডুবাইবার পর যখন শোভাযাত্রা ফিরিয়া যায় তখন গুণিন্‌রা গান গাহিতে গাহিতে যাইতে থাকে; এবং মধ্যে মধ্যে শোভাযাত্রা থামাইয়া ঢোলের তালে তালে 'সাক্ষী' গাওয়া হয়। এই 'সাক্ষী' হইতেছে পুরাণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে রচিত কতকগুলি কবিতা। এগুলি গুণীন্‌রা অনেক পুরাণ ঘাঁটিয়া নিজেরা রচনা করিয়া রাখে, যাহাতে অন্য কেহ সে 'সাক্ষীর' উত্তর দিতে না পারে। কাজেই গুণিন্ অনুসারে 'সাক্ষী'ও নূতন নূতন হয়। 'সাক্ষী'-গুলির শেষে অনেক সময় রচয়িতার নাম ও ঠিকানা দেওয়া থাকে। গুণিন্‌রা যদি 'সাক্ষী'র উত্তর দিতে না পারে, বড় অপ্রস্তুত হয়, আর যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রা লইয়া মিছিল করিয়া চলিয়া যায়।

এইবার কতকগুলি 'সাক্ষী' যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার মধ্যে কয়টি আপনাদিগকে উপহার দিব ; আশা করি, সুধীগণ তাহার উত্তর দিয়া গুণিন্‌গণের মান রক্ষা করিবেন।

(১)

একদিন পুরঞ্জন মৃগয়ার তরে।
প্রবেশ করিল গিয়া বনের ভিতরে॥
পথশ্রমে বসিল এক বৃক্ষের ছায়ায়।
আচম্বিতে রমণী এক দেখিবারে পায়॥
রমণীর রক্ষা হেতু ১১১ জন।
করিতেছে রমণীর পশ্চাতে ভ্রমণ॥
অগ্রেতে সর্প এক পঞ্চমুখ তার।
তার পর দশ জন পুরুষ আকার॥
পুরুষ আকার যেই দেখি দশ জন।
প্রত্যেকের দশটি নারী দেখি কি কারণ॥
ইহার বৃত্তান্ত কথা বলিবে আমারে।
তবে 'সাক্ষী' মানি আমি সবার গোচরে॥
না বলিতে পার যদি ফিরে যাও ঘরে।
ঢাক ঢোল ঘট রেখে সবার মাঝারে॥

(২)

কুণ্ডল রাখিয়া উতঙ্ক স্নান হেতু গেল।
ক্ষপণক বেশে তক্ষক কুণ্ডল হরিল॥
উতঙ্ক ক্ষপণককে যখন দেখিল।
দৌড়িয়া গিয়া তার জটেতে ধরিল॥
জটেতে ধরিবা মাত্র নিজরূপ ধরি।
বিবরে প্রবেশি গেল পাতাল নগরী॥
কাষ্ঠের দ্বারাতে পথ করিতে লাগিল।
ইন্দ্র কৃপা করি তাহে বজ্র নিয়োজিল॥
বজ্রের আঘাতে এক সুড়ঙ্গ হইল।
সেই সুড়ঙ্গ দিয়া উতঙ্ক পাতালে প্রবেশিল॥
পাতালেতে নাগরাজ বহু স্তুতি করি।
দেখান আশ্চর্য্য এক যাই বলিহারী॥
দুইটি রমণী বসি তন্ত্রের উপরি।
কেহ শুক্ল কেহ কৃষ্ণ গুণে সারি সারি॥
বারোটি সূত্রেতে গুণে ছয় গাছি তার।
২৪ পর্ব্বেতে ৩৬০ শলাকা তার॥

এক চক্রে গাঁথা তন্ত্র বল সে কেমন !
শুনিব ইহার কথা এই নিবেদন ॥

(৩)

একদিন ভীমসেন মৃগয়া কারণ।
ঘোর অরণ্যেতে তিনি করয়ে ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলেন পর্ব্বত গুহায়।
আচম্বিতে এক সর্প দেখিবারে পায় ॥
সর্প দেখি ভীমসেন ভাবে মনে মন।
হেন সর্প পৃথিবীতে না দেখি কখন ॥
বদন বিস্তার সর্প করয়ে যদ্যপি।
ত্রিপুর সহিত সব গ্রাসিবে পৃথিবী ॥
সমুখে দেখিয়ে ভীমে করিয়া গর্জ্জন।
লেজের দ্বারায় তারে করিল বন্ধন ॥
ভীমে গিলিবারে সর্প বদন বিস্তারিল।
সভয়েতে ভীম নিজ পরিচয় দিল ॥
পরিচয় পেয়ে সর্প সকলি বুঝিল।
তবে সর্প তারে এক প্রশ্ন করিল ॥
উত্তর করিতে ভীম না পারিল তার।
সর্প বলে এইবার করিব আহার ॥
উদ্ধার করহ গুণী ভীমের জীবন।
সর্পরূপ ধরে বল কেবা সেই জন ॥

(৪)

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
পরীক্ষিতে সর্পাঘাত হইল যখন ॥
বহুরূপ মন্ত্র বিদ্যা পৃথিবীতে ছিল।
বেদ-মন্ত্র-বলে সর্প অগ্নিতে পুড়িল ॥
যে মন্ত্র প্রভাবে ভাই নন্দের নন্দন।
কালিদহে করেছিল কালীয় দমন ॥
তক্ষক নাগ নিয়েছিল ইন্দ্রের শরণ।
মন্ত্র তেজে ইন্দ্র সহ টলে ইন্দ্রাসন ॥
দেব দেব মহাদেব দেব শূলপাণি।
সমুদ্র মন্থনে বিষ খাইল আপনি ॥
বীজ-মন্ত্র শুনে শিবের বিষ ভস্ম হল।
অচেতন ছিল শিব উঠিয়া বসিল ॥

মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রে পূর্ব্বে মুনিগণে।
মৃতকে জিয়াতে পারে শুনেছি পুরাণে॥
সিন্ধুমুনি ঋষিগণ ছিলেন তথায়।
কেহ কি নহিল শক্য রাখিতে রাজায়॥
ব্রহ্ম-শাপে মুক্ত রাজা তক্ষক দংশনে।
পরে কেন না জীয়াল মৃত-সঞ্জীবনে॥
ইহার বৃত্তান্ত কথা বলিবে আমারে।
এই সব থাকিতে কেন পরীক্ষিত মরে॥

এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর যাহা শুনিয়াছি তাহা এই,—

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
সর্পাঘাতে পরীক্ষিত মৈল কি কারণ॥
ধ্যানমগ্ন ঋষিবর অচেতন ছিল।
ক্রীড়াচ্ছলে পরীক্ষিত সর্প গলে দিল॥
ধ্যান-ভঙ্গে ক্রোধে ঋষি শাপ তারে দিল।
সপ্তাহের মধ্যে তারে তক্ষক দংশিল।
পরমায়ু শেষ রাজার কে রক্ষিতে পারে।
ব্রহ্ম-শাপে মহারাজ পরীক্ষিত মরে॥
'সাক্ষী' হল সমাধান ভঞ্জভূম নিজ স্থান
কোতবাজারে বাড়ী হয়।
আস্বাদ মোর অখিল গুণী বহুত গুণের গুণাগুণী
তার শিষ্য এই 'সাক্ষী' কয়॥
'সাক্ষী' শুনি তুষ্ট এবে ছাড়ি দেহ স্থান্।
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাপান্॥
মাকে আনতে যাব রে—ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় *

বুদ্ধের উপদেশ

সম্যক্‌সম্বোধি লাভের পর মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ আর্য্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রচার করেন। দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চারিটি সত্যই আর্য্যসত্য। দুঃখ থাকিলেই তাহার সমুদয় বা কারণ আছে। সেই দুঃখের নিরোধ করিতে অবশ্যই পন্থা বা মার্গ আছে। আবার দুঃখের প্রকৃত কারণ বা নিদান জানা চাই। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, ও জরামরণ এই দ্বাদশ নিদানই প্রতীত্যসমুৎপাদ। অজ্ঞানতাই অবিদ্যা, কিঞ্চিন্মাত্র চেতনার সংস্কার, পূর্ণ চেতনা হইলে বিজ্ঞান, তৎপরে দ্রব্যের নাম ও রূপের জ্ঞান জন্মে, নামরূপের উপলব্ধি হইলে ষড়ায়তন বা ষড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হইতে বাহিরের বস্তুর সহিত স্পর্শ ঘটে, সেই সংস্পর্শ হইতে বেদনা বা অনুভূতি, অনুভূতি হইতে তৃষ্ণা বা দুঃখ দূরীকরণ ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা। এই তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা কার্য্যের চেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে এমন একটা অবস্থা আসে যাহা ভালও হইতে পারে বা মন্দও হইতে পারে, এই অবস্থার নাম ভব। তাহার পরেই জাতি বা নবজীবনের উৎপত্তি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং জীবনে শোক দুঃখ জরা মরণ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যাহাতে এই জরা মরণ দুঃখাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সেই পন্থা আবিষ্কার করাই বুদ্ধ ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই অমঙ্গল। এই অমঙ্গল পরিহার করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

নির্ব্বাণ-কামী জীবের চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। যাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই চারি অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে :—স্রোতঃ-আপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। ইঁহাদের নাম শ্রাবক বা সেবক। (১) যিনি প্রথম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম স্রোতঃ-আপন্ন। ইনি সংযোজন বা মানব প্রকৃতির প্রথম তিন বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন বিপদের ভয় নাই। (২) যিনি আর একবার মাত্র মানবজন্মলাভ করিবেন, তিনি সকৃদাগামী। তিনি রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিন রিপুকেও অনেকটা বশীভূত করিয়াছেন। (৩) পঞ্চ বন্ধন হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই অনাগামী। কামশোকে তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবেনা। ব্রহ্মলোকে জন্ম হইবে। (৪) যিনি সমুদয় মলিনতা দূর করিয়াছেন, সকলপ্রকার ক্লেশ উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনপ্রকার প্রলোভনেও যিনি নীতিপথ হইতেই বিচ্যুত হন নাই, যাঁহার

---

* ১৩৩৭ সালের ১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালার জন্য 'বঙ্গে আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিত হয়, এই প্রবন্ধ তাহার প্রথমাংশ; শেষাংশ উক্ত লেখমালার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই অর্হৎ। তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

যাঁহারা উক্ত চারি অবস্থার পথিক তাঁহারাই প্রকৃত আর্য্য। আর্য্যের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য নির্ব্বাণলাভ। নির্ব্বাণ আবার দুই প্রকার—অর্হতেরা এই সংসারে থাকিয়া যে নির্ব্বাণ-লাভ করেন, তাহাই প্রথম নির্ব্বাণ।—ইহাই বৈদান্তিকগণের জীবন্মুক্তি। অন্য নির্ব্বাণের নাম পরিনির্ব্বাণ। মৃত্যুর পর বুদ্ধগণই এই নির্ব্বাণের অধিকারী। এই নির্ব্বাণলাভে চিরকালের জন্য সকল প্রকার যন্ত্রণার অবসান হয়। বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা এবং অনন্ত কালস্থায়ী। বৌদ্ধধর্ম্মের উহাই মূল সূত্র।

শাক্যবুদ্ধ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী প্রধান শিষ্যগণ প্রথমে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। পরে যখন গৃহিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের উপযোগী ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইল। কালে উক্ত মতবাদের উপর বহু অবান্তর শাখা-প্রশাখা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ বৌদ্ধসমাজ তিনটি যানে বিভক্ত হন,—১ম শ্রাবকযান, ২য় প্রত্যেকযান, ৩য় মহাযান।*

প্রথম যাঁহারা বুদ্ধের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুসারে চলিতেন, তাঁহারা শ্রাবকযান নামে পরিচিত হন। বুদ্ধ নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর, আবার কাহারও মতে তাহারও কিছু পরে মহাযান বা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মমত প্রচলিত হয়। মহাযান সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত শ্রাবকযানকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে হীনযান বলিয়া নিন্দা করিতেন। এইরূপে তিনটি যান থাকিলেও প্রধানতঃ বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

হীনযান ও মহাযান

হীনযান হইতে বৈভাষিক এবং মহাযান হইতে সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার মত প্রবর্ত্তিত হয়। আচার্য্য নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক মত প্রচার করেন। তাঁহার মূল মন্ত্র "সর্ব্বম্ অনিত্যং সর্ব্বং শূন্যং সর্ব্ব অনাত্মম্।" উপনিষদ্ ও গীতার "পরমব্রহ্ম"ই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক "মহাশূন্য" নামে প্রচারিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক মায়াবাদ ও মাধ্যমিকের শূন্যবাদ মূলতঃ এক। নাগার্জ্জুন ঘোষণা করেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তারা প্রভৃতি দেবতার পূজা, যাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে, ঐহিক বা সাংসারিক মঙ্গলের জন্য তাহা করণীয়। এই দেবমূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণেরা মহাযান শ্রমণদিগকে অনেকটা স্বধর্ম্মী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

মহাযান ধর্ম্মের বহুল প্রচারের কারণ এই সম্প্রদায় ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে ধ্যান, ধারণা ও সাধনা ধর্ম্মের অঙ্গমাত্র। সর্ব্বজীবে দয়া ও সহানুভূতি এই ধর্ম্মের লক্ষ্য। কর্ম্মশূন্য অর্হৎগণ অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণকেই ইঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন।

---

* অষ্টসহস্রিকা, ১৪ পৃষ্ঠা।

মহাযান ও হীনযান মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও সকলের চরম গতি এক। সকলেই তথাগতের এই বাণী বিশ্বাস করেন, "আমি সকল জীবকেই নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইব।" "সমুদয় জীব আমারই সন্তান।"

মন্ত্রযান

মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জীবাত্মা ও পরমাত্মা মিলনরূপ যোগ স্বীকার করিতেন, তাঁহারাই 'যোগাচার' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। এই যোগাচার হইতে খ্রীঃ ৭ম শতকে মন্ত্রযানের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় নানা প্রকার চক্র, জপ, তপ, মন্ত্রতন্ত্রাদি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া 'মন্ত্রযান' নামে পরিচিত হন।*

মন্ত্রযানের ভিতর তন্ত্র ও ইন্দ্রজালের প্রভাব প্রবেশ করিয়া মূল বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে একব্রহ্ম বা শূন্যবাদের ভিতর বহুদেববাদ আসিয়া মিলিত হইল; তখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকে ও হিন্দু তান্ত্রিকে বিশেষ পার্থক্য রহিল না।

বজ্রযান

মন্ত্রযানের মধ্যে যাহারা বেশী তান্ত্রিক বা শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারাই বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দেবী কালীর মূর্ত্তির সহিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। আদিবুদ্ধের সহিত মহাকালীর মিলনরূপ গুহ্য-তত্ত্বই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের এই গুহ্য পদ্ধতি খ্রীঃ ১০ম শতকে 'কালচক্র' নামে চলিয়াছিল। নানাপ্রকার বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও ডাক ডাকিনীর সাধনায় সিদ্ধি হইতে পারে, ইহাই বজ্রযান ও কালচক্রযানের লক্ষ্য ছিল। অর্হৎপদ বা সম্যক্‌সম্বোধিলাভ যে মহাধর্ম্মের চরমলক্ষ্য ছিল, নানা বীভৎস তান্ত্রিক ব্যাপার লইয়া সেই ধর্ম্মে বজ্রযান, পরে কালচক্রের প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িল।

পাল-রাজবংশ ও অনুত্তর-মহাযান।

পালবংশের সংস্কার, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ

খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে গৌড়ে পালরাজবংশের অদ্বিতীয় প্রভাব প্রসারিত হয়। গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল হইতে পরবর্ত্তী সকল পালনৃপতিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন। তাঁহাদের শাসনকালে খ্রীষ্টীয় ৯ম, ১০ম, ও ১১শ শতকে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পালরাজগণের নিকট যথেষ্ট উৎসাহলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুতর ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতের টেঙ্গুর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহাদের উপদেশ ও লেখনীর গুণে যেমন একদিকে মহাযান ধর্ম্মের সংস্কার চলিতেছিল, অপর দিকে বজ্রযানের মধ্যে ও পরে কালচক্রযানের ভোগবিলাসমূলক শক্তিসাধনা, বীভৎস শব সাধনা, ও নানাপ্রকার কুৎসিত অনাচারে লোক সাধারণকে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত

* পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬ সালে আষাঢ় সংখ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের 'মন্ত্র' প্রবন্ধে 'মন্ত্রযানের' বিশদ পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

করিতেছিল। বলিতে কি, গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ লোকই আপাতসুখকর প্রবৃত্তিমার্গে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। প্রবৃত্তিই সকল শোক দুঃখের কারণ। তপস্যা ও ধ্যান ধারণা দ্বারা আনন্দময় অবস্থালাভই নিবৃত্তিমার্গের আকাঙ্খা—এই অবস্থায় মহাশূন্যজ্ঞান দ্বারা নির্ব্বাণপদপ্রাপ্তিই নিবৃত্তিমার্গীর শেষ লক্ষ্য।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গে ভেদাভেদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুখস্বচ্ছন্দ ও ভোগবিলাস দ্বারা আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনই প্রবৃত্তিমার্গীর নিকট মোক্ষ, প্রেম, শুদ্ধি ও মহাত্যাগ দ্বারা আত্মার মহাশূন্যে লয়ই নিবৃত্তিমার্গীর নিকট চরম নির্ব্বাণ।

পালবংশের রাজনীতি

পালবংশ বৌদ্ধ হইলেও তাঁহাদের রাজসভায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আচার্য্যগণ সমভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহাবীর রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মপাল একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মানার্থ বহু তাম্রশাসন দান করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে বিক্রমশিলায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারই সময়ে মহাযান মতের উপযুক্ত সংস্কারের আয়োজন হইয়াছিল। তৎপুত্র পরমসৌগত নৃপতি দেবপাল যশোবর্ম্মপুরে বিহার পত্তন করেন। ইহাই অধুনা 'বিহার' নামে পরিচিত। রাজা দেবপালের সময়েই নগরহার-নিবাসী বৌদ্ধাচার্য্য বীরদেব যশোধর্ম্মপুরে বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দেবপালই উক্ত বীরদেবকে নালন্দা-বিহারের পরিচালন ভার দিয়াছিলেন।

বজ্রাচার্য্যগণ ও সহজাচার্য্যগণ

তিব্বতীয় টেঙ্গুর হইতে নানা বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রণেতা নিম্নলিখিত বজ্রাচার্য্যগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। বরেন্দ্রবাসী মহাচার্য্য চন্দ্রগোমিন্, কায়স্থাচার্য্য টঙ্কদাস, জগদ্দলবাসী দানশীল ও মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র, মহাপণ্ডিত জ্ঞানশ্রী বা জ্ঞানবজ্র, কায়স্থ মহোপাধ্যায় গয়াধর, মহাচার্য্য কায়স্থ তথাগত রক্ষিত, সরহ বা রাহুলভদ্র, বৈরোচনবজ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশ, দুর্জ্জয়চন্দ্র, নারো বা নাড়পাদ, প্রজ্ঞাবর্ম্মা, রাহুলশ্রী, লুইপাদ, বিদ্যাকরসিংহ, সিদ্ধাচার্য্য জালন্ধরীপাদ, ভুসুকু, কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য, ধর্ম্মপাদ বা ধামপা, কম্বল বা কামলী, কম্বল বংশে কঙ্কণ, বিরূপ, শান্তিপাদ, শবরীপাদ, চাটিল, কুক্কুরীপাদ, অদ্বয়বজ্র, লীলাপাদ, স্বগণ, মৈত্রীপাদ, গুরুভট্টারক বৃষ্টিজ্ঞান, মাতৃচেট, মহাসুখতাবজ্র, কুমারচন্দ্র, মগধরাজ ডোম্বী হেরুক ও আচার্য্য তারিণীসেন। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সহজিয়া আচার্য্যদিগের মধ্যে টেঙ্গুরে আচার্য্য কালপাদ, কম্বালিন্ বা কুম্ভকার, কুমার কলস, কুশলীপাদ, তেলিপ বা তৈলিকপাদ, ও উপাধ্যায় জয়দেবের নাম পাওয়া যায়।

বিদুষী আচার্য্য মহিলা

উপরোক্ত আচার্য্যগণই যে সময়োপযোগী বৌদ্ধশাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেবল তাহাই নহে। অনেক আচার্য্য-মহিলা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করিয়া